ওলীআল্লাহদের মা

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র.

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

ওলীআল্লাহদের মা

অনুবাদ
রাবেয়া বিনতে সালমান

আল-ইরফান পাবলিকেশন্স
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৭১৬৫৪৭৮৫৬

সূচীপত্র

ওয়ালীআল্লাহদের মা

মুসলিম নারীদের সমীপে

ওয়ালীআল্লাহদের মা

সুলতানুল মাশাইখ হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ.

হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ. এর বয়স তখন পাঁচ বছর। সহসা পিতৃছায়া উঠে গেল মাথা থেকে। তার মা ছিলেন সমকালের একজন পুণ্যময়ী ও আল্লাহওয়ালা রমণী। তিনি এই ইয়াতীম রত্নটির লালন-পালন এবং ধর্মীয় শিক্ষা ও চারিত্রিক দীক্ষার ব্যবস্থা করেন অসীম সাহসিকতা আর পিতৃস্নেহের সাথে। যখন সম্মানের পাগড়ি পরিধানের সময় হল, তিনি তখন মায়ের কাছে এসে বললেন, মুহতারাম উস্তাদ পাগড়ি প্রদানের আদেশ করেছেন। আমি পাগড়ি আনব কোত্থেকে? মমতাময়ী মা বললেন, বাবা শান্ত হও! মন স্থির রাখ। আমি এর ব্যবস্থা করব। সুতরাং তিনি তুলা ক্রয় করে প্রথমে সুতা বানালেন, তারপর দ্রুত পাগড়ি প্রস্তুত করে দিলেন। মা জননী এ উপলক্ষ্যে সানন্দে দেশের অনেক আলেম, নেনকার বুযুর্গদের দাওয়াত করলেন।

হযরত খাজা রহ. বললেন, আমার আম্মাজানের নিয়ম ছিল, যেদিন আমাদের ঘরে রান্নার কিছুই থাকত না, সেদিন আম্মাজান বলতেন– আজ আমরা সবাই আল্লাহর মেহমান। একথা শুনে আমার বেশ আনন্দ হত। সহসা একদিন আল্লাহর কোনও বান্দা ঘরে এসে এক ঝুড়ি আটা দিয়ে গেলেন। ফলে তা দিয়ে পর পর বেশ কয়েকদিন রুটি তৈরি হতে থাকে। আমি সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গেলাম। তীব্রভাবে আকাঙ্ক্ষা করতে লাগলাম– আমার মা জননী কবে বলবেন, আজ আমরা সবাই আল্লাহর মেহমান। অবশেষে একদিন ফুরিয়ে গেল সে আটা। আর আম্মাজান বললেন, আজ আমরা সবাই আল্লাহর মেহমান। একথা শুনে আমার মধ্যে এত আবেগ-উচ্ছ্বাস ও আনন্দ ঠিকরে পড়ল যে, তা ভাষায় ব্যক্ত করার নয়।

একদিন খাজা সাহেব রহ. তাঁর মায়ের মৃত্যুর কথা বর্ণনা করলেন। কথায় কথায় হঠাৎ তাঁর এত কান্না পেয়েছিল যে, তাঁর কথাগুলো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল না। তখন তিনি আবৃত্তি করেন,

افسوس ولم کہ ہیچ تدبیر نہ کرد
شبہائے وصال را زنجیر نہ کرد

(আক্ষেপ! শত কষ্ট-দুঃখ বুকে
যায় নি করা কোনও তদবীর,
গেল না তারে বাঁধা ওরে
টানিয়া শিকল-জিঞ্জীর।)

হযরত খাজা সাহেব রহ. বলেন, একদিন নতুন চাঁদ দেখে মায়ের কাছে হাজির হলাম। পদচুম্বন করলাম তাঁর। যথারীতি নতুন চাঁদের শুভেচ্ছা জানালাম তাকে। তিনি বললেন, পরের মাসে চাঁদ উঠলে কার পদচুম্বন করবে? আমি বুঝে ফেললাম, তাঁর মৃতুর সময় নিকটবর্তী। ভারাক্রান্ত হয়ে গেল আমার মন। কাঁদতে শুরু করলাম আমি। বললাম, সম্মানিতা মা জননী! এই নিঃস্ব-অসহায়কে আপনি কার হাতে ন্যস্ত করছেন? মা বললেন, এর জবাব আগামী দিন দিব। আমি বললাম, আজ এখন কেন দিচ্ছেন না? এরপর তিনি বললেন, যাও! আজ রাতটা শাইখ নাজীবুদ্দীন রহ. এর ওখানে কাটাও। আমি তাঁর কথামত সেখানে গেলাম। শেষ রাতে প্রায় সকাল বেলা তাঁর খাদেমা দৌড়ে এসে বলল– জননী তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি জানতে চাইলাম, তিনি ভাল আছেন তো? বলল, হ্যাঁ! আমি যখন মায়ের খেদমতে এসে হাজির হলাম, তখন তিনি বললেন– কাল তুমি আমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে, আমি তার জবাব দেওয়ার অঙ্গিকার করেছিলাম। এখন আমি তার জবাব দিচ্ছি। মনোযোগ দিয়ে শোন! এরপর বললেন, তোমার ডান হাত কোনটি? আমি ডান হাত বাড়িয়ে দিলাম। তিনি আমার হাত তার হাতের মুঠোয় নিলেন। বললেন, "হে আল্লাহ! আমি একে তোমার দায়িত্বে ন্যস্ত করছি।" একথা বলা মাত্র তার প্রাণবায়ূ বেরিয়ে গেল আল্লাহর সান্নিধ্যে। আমি এজন্য মহান আল্লাহর অশেষ শোকরিয়া করলাম। মনে মনে বললাম, আমার মা যদি স্বর্ণ-মুক্তায় ভরা একটি ঘর রেখে যেতেন, তাতে আমার এত বেশি আনন্দ হত না।

হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ রায়বেরলী রহ.

এমন মা পৃথিবীতে খুব কমই আছেন, যিনি আপন পুত্রের জীবন পরীক্ষায় পূর্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন। নিজ হাতে বিদায় দিয়েছেন মৃত্যুর জন্য। আল্লাহ তা'আলা এমন মা-ই দিয়েছিলেন হযরত সাইয়িদ শহীদ রহ.কে। যিনি ছিলেন হযরত আসমা রাযি. এর পথিকৃৎ। একবার এক যুদ্ধ চলাকালে সাইয়িদ সাহেব আগ্রহ প্রকাশ করলেন, তিনি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন। কিন্তু গৃহপরিচারিকা তাকে যেতে দিল না কিছুতেই। মা জননী তখন নামায পড়ছিলেন। সাইয়িদ সাহেব ছিলেন অপেক্ষায় দণ্ডায়মান– মা সালাম ফিরালে পরে গিয়ে অনুমতি চাইবেন। তিনি সালাম ফিরানোর, গৃহপরিচারিকাকে বললেন, বুয়া! আহমদের প্রতি তোমার অবশ্যই মহব্বত আছে। কিন্তু আমার মতো আদৌ নয়। এটা বারণ করার সময় ছিল না। যাও বেটা! আল্লাহর নাম

নিয়ে যাও। কিন্তু সাবধান! পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। অন্যথায় তোমার মুখ দেখব না।

হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী রহ.

হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী রহ. এর মা ছিলেন বড় যাহেদ, তাওয়াক্কুলওয়ালা, দুনিয়াবিমুখ ও আল্লাহর উপর নির্ভরশীল রমণী। তিনি বলেন, আমার বয়স তখন বার/তের বছর, আমার সম্মানিতা আব্বাজান ইন্তিকাল করলেন। হাতে যে টাকা-পয়সা ও পুঁজি ছিল, কিছুদিনের মধ্যে তা খরচ হয়ে গেল। ভারী সঙ্কটে পড়ে গেলাম আমরা। আম্মাজান যতদিন দৈন্যদশা ছিল বাড়ির গেট বন্ধ রাখেন। বাড়ির ভিতর যে গাছ ছিল, তার পাতালতা ছিড়ে সিদ্ধ করে খেয়ে নিতেন। কাউকে নিজের অবস্থা সম্পর্কে জানতেই দিতেন না। অথচ আত্মীয়-স্বজনের অনেকেই ছিলেন, যারা সাহায্য করতেন। কিন্তু তার এটা পছন্দ ছিল না।

হযরত মাওলানা ইলিয়াছ সাহেব কান্ধেলবী রহ.

মাওলানা ইলিয়াছ রহ. ছিলেন কান্ধেলা, মুযাফ্ফর নগর জেলার এক প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত বংশের বিশিষ্ট এক বুযুর্গ। সেসময় কান্ধালার এই বংশ ছিল দ্বীনের প্রাণকেন্দ্র। উজ্জ্বল ফোয়ারা। এ বংশের পুরুষ তো ভাল, নারীদের দীনদারী-ধার্মিকতা, ইবাদত-বন্দেগী, রাত্রিজাগরণ, যিকির ও তিলাওয়াতের ঘটনাবলী এবং তাদের মা'মূলাত (আমলের নিয়মতান্ত্রিকতা) এ যুগের হীনম্মন্য দুর্বলপ্রাণ লোকদের কল্পনারও অনেক ঊর্ধ্বে। ঘরের মধ্যে নারীরা সাধারণত নফল নামাযেও কুরআন শুনত মন দিয়ে। রমাযান শরীফে কুরআনে কারীম পঠন-পাঠনের বিস্ময়কর বসন্ত বিরাজ করত। জায়গায় জায়গায় ঘরে ঘরে কুরআনে কারীম থাকত। পড়া হত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত। মহিলাদের এত বেশি ইলম-জ্ঞান ও আগ্রহ ছিল, যার ফলে তারা কুরআনে কারীম পড়ে পড়ে স্বাদ গ্রহণ করত। নামাযে এতই নিমগ্নতা ও ধ্যান-তন্ময়তা ছিল, যার ফলে অনেক সময় কোনও কোনও নারীর ঘরে পর্দার ব্যবস্থা করা, এমনকি ঘটনা-দূর্ঘটনায় ঘরে মানুষের আসা-যাওয়ারও অনুভূতি থাকত না।

কুরআনে কারীম তরজমা ও উর্দূ তাফসীরসহ, মাযাহেরে হক, মাশারিকুল আনওয়ার, হিসনে হাসীন ইত্যাদি ছিল নারীদের সর্বোচ্চ নেসাব (পাঠ্যসূচি)। বংশ-পরিবাররে যার ব্যাপক প্রচলন ছিল। সেসময় ঘরের ভেতর-বাইরের বৈঠক ও মিলনমেলাগুলো সতজে-প্রাণবন্ত ছিল হযরত সাইয়িদ সাহেব রহ. এবং হযরত আব্দুল আযীয রহ. এর বংশও পরিবারের ঘটনাবলী চর্চায়।

সেসব বুযুর্গদের ঘটনাগুলো ছিল পুরুষ ও নারীদের মুখে মুখে। মায়েরা, বোনেরা এবং গৃহপরিচারিকা নারীরা শিশুদেরকে তোতা-মীনার কাল্পনিক মিথ্যে কিচ্ছা-কাহিনীর পরিবর্তে শোনাতেন এসব আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক ঘটনাবলী। হযরত মাওলা ইলিয়াছ রহ. একদিন এ ধরনের অবস্থাবলী আলোচনার পর বলেন, এই তো ছিল মাতৃকোল, যেখানে আমরা বেড়ে উঠেছি। আজ এমন মায়ের কোল কোথায় পাওয়া যাবে?

হযরতের নানী বিবি আমাতুর রহমান – যিনি ছিলেন মাওলানা মুযাফ্ফর হুসাইন রহ. এর কন্যা। যাকে তাঁর বংশে সাধারণত "উম্মী বী" নামে ডাকা হত, তিনি ছিলেন একজন রাবেয়া চরিত্রের নারী। শেষ বয়সে তার অবস্থা হয়েছিল এমন যে, তিনি কখনও নিজে খাবার চেয়ে খেতেন না। কেউ এনে রেখে দিলে খেয়ে নিতেন। ঘর ছিল বড়। কাজের চাপ এবং অধিক ব্যস্ততার কারণে কারও খেয়াল না-হলে ক্ষুধার্ত বসে থাকতেন। একবার কেউ বলল– আপনি এরূপ দুর্বল-নিঃস্ব অবস্থায় থাকেন কিভাবে? তখন তিনি বললেন, আল-হামদু লিল্লাহ! (আল্লাহর শোকর) আমি তাসবীহ-তাহলীলের দ্বারা আহার করে নিই।

স্বয়ং মাওলানার মাতা মহোদয় খুবই ভাল হাফেযায়ে কুরআন ছিলেন। তিনি কুরআনে হিফয করেছিলেন বিয়ের পর। আর এতই ইয়াদ ছিল, কোনও সাধারণ হাফেয তার সম্মুখে দাঁড়াতে পারত না। নিয়ম ছিল, রমাযানে প্রতিদিন পূর্ণ কুরআন শরীফ এবং অতিরিক্ত দশ পারা পড়ে নিতেন। পড়া এত চালু ছিল যে, ঘর-দুয়ারের কাজকর্ম ও ব্যবস্থাপনায় বিঘ্ন ঘটত না বরং তিলাওয়াতের সময়ও হাতে কোনো কাজ চালিয়ে যাওয়ার অভ্যাস ছিল। এসব পুণ্যময়ী ঈমানদীপ্ত রমণীদের ঈমান-আমল, আখলাক-চরিত্র ও জীবনধারার সুফলে তাদের প্রভাবময় সংশ্রবের অবারিত কল্যাণে হযরত মাওলানা ইলিয়াছ রহ. এর মতো বুযুর্গ তৈরি হয়েছেন, যার মাধ্যমে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর বিরাট উপকার এবং প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়েছে।

সমকালের প্রসিদ্ধ কবি ডাঃ স্যার মুহাম্মদ ইকবাল রহ, যার কবিতাগুলো ঈমানী চেতনা আর অন্তর্জ্বালায় পরিপূর্ণ। যিনি তাঁর সেসব কবিতার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে এনে দিয়েছেন নতুন জীবন। দান করেছেন নতুন স্বপ্ন, আশা-ভরসা আর হৃদয়োত্তাপ। তিনি তার সকল উন্নতি, জাগরণ, ঈমানী চেতনা আর অন্তর্জ্বালা ও দহনকে ভাবতেন আপন মায়ের লালন-পালন এবং পবিত্র গর্ভের সুফল। বলতেন, আমার মধ্যে ঈমান ও এশকের যে জ্বলন-অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আছে, তা আমার মায়ের শিক্ষাদীক্ষার ফসল। আমি যা কিছু

পেয়েছি, সবই তার কোল এবং তার শিক্ষাদীক্ষায় পেয়েছি। এই অমূল্য ধন-রত্ন পাওয়া যায় ঈমানদার ধর্মানুরাগী মায়ের দীক্ষার কোল থেকে। কলেজ-ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে নয়। তিনি সেকথাই বলেছেন নিম্নোক্ত কবিতায়।

مرا داد ایں پرور جنونے
نگاہ مادر پاک اندرونے

زمکتب و چشم ودل نتواں گرفتن
کہ مکتب نیست جز سحر وفسونے

আমার মুহতারামা আম্মাজান (খাইরুন নিসা রহ.)

[উল্লেখ্য যে, হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী মিয়া রহ. তাঁর সম্মানিতা মা মহিয়সী রমণী খায়রুন নিসা রহ. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী “যিকরে খয়ের” নামে রচনা করেছেন। নিচে তারই গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ সংযোজন করা হচ্ছে। হযরত মাওলানার একটি চমৎকার শিরোনাম চয়ন “আউলিয়াদের মা”। এটা তার নিজের ওয়ালী হওয়ার স্বরগোতুক্তি নয়। তিনি নিজেকে একজন ওয়ালী মনে করে তাঁর (মায়ের) আলোচনা করেন নি। কিন্তু এই অধম লেখক এই সংযোজনকে জরুরী মনে করছি। কারণ, হযরত মাওলানা রহ. এর আম্মাজান নিশ্চিত সমকালের একজন বিশিষ্ট কামেল শাইখের মা ছিলেন। আর তাঁর আলোচনা উক্ত শিরোনামের অধীনে আসাই উচিত ছিল।

তিনি বলেন, আমার নানা সাহেবের ছিল দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যা। আমার (হযরত মাওলানা) বড় মামা সাহেবের নাম ছিল সাইয়িদ আহমদ সাঈদ। ছোট মামা মৌলভী হাফেয সাইয়িদ উবাইদুল্লাহ সাহেব। আমার মা ছিলেন বোনদের মধ্যে চতুর্থ। তিন বোন ছিল তার বড় আর এক বোন ছোট, নানাজীর জীবদ্দশায়ই তার ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছিল। আমার আম্মাজান জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৮ খ্রিঃ/ ১২৯৫ হিজরীতে। তার নাম রাখা হয় খাইরুন্ নিসা। আম্মাজান কয়েকবার বলেছেন এবং সবাই এর সমর্থন অকুণ্ঠ করেছেন যে, নানাজীর নিজ সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মহব্বত-স্নেহ ও মিল ছিল তার সঙ্গে। বলতেন, কোনও ভাল কিতাব আসলে আমাকে দেখতে দিতেন। আলোচনা করতেন আমার সাথে। আর এটাই ছিল তার সবচেয়ে বড় মনোযোগ ও স্নেহ-মহব্বতের নিদর্শন। বলতেন, আব্বাজান যখন তাহাজ্জুদের সময় উপরতলা থেকে নেমে মসজিদে যেতেন, তখন আমার চোখ খুলে যেত। আমি এবং আমার আরেক বোন সালেহা বিবি দুজনেই আম্মাজনের কাছে উপরতলায় চলে যেতাম।

সেখানে তার সাথে নফল পড়তাম এবং লিপ্ত থাকতাম যিকির-আযকার ইত্যাদিতে। আমাদের অপর বোন এবং অন্যান্য সাহোদরদের এতে ভারী ঈর্ষা হত। তারাও চেষ্টা করত এজন্য। কিন্তু প্রায়ই তাদের চোখ খুলত না।

মুহতারাম আম্মাজানের রান্না-বান্না, সেলাই ইত্যাদির প্রতি জন্মগত আগ্রহ ছিল। তিনি এসব ক্ষেত্রে উস্তাদসুলভ দক্ষতা রাখতেন। তাঁর রুচি-মানসিকতা শুরু থেকেই সৃজনশীলতা, নতুন নতুন আবিষ্কার-উদ্ভাবন/তথ্য উপাথ্য বের করা এবং নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনে অভ্যস্ত ছিল। তাকে এসব কাজে বংশের মধ্যে একজন আবিষ্কারক ও একধরনের মুজতাহিদ জ্ঞান করা হত। নানাজীর মানসিকতায়ও (বুযুর্গ ও সাদাসিধে ভাবের সাথে) সূক্ষ্মদর্শিতা ও হাস্যরস ছিল। সুচারু-সুশৃঙ্খল ও ভারসাম্য জিনিস তার পছন্দনীয় ছিল। এজন্য নানা সাহেবও তার দ্বারা প্রায় সময় এ ধরনের কাজ করাতেন। নানা সাহেবের একটি আবা, যা তিনি ঈদের সময় পরতেন– আজও আমাদের হাতে বিদ্যমান আছে। যার উপর আম্মাজানের হস্ত মুবারকের রেশমী কাজ করা আছে। তা দেখে এখনও মনে হয় যেন বড় কোনও হস্তশিল্পী এইমাত্র কাজ শেষ করে ওঠেছেন।

শিক্ষা ও অধ্যায়ন

খান্দানে মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার প্রচলন খুবই সীমিত ও নির্দিষ্ট পর্যায়ে ছিল। মেয়েদের বেশি লেখাপড়া ও শিক্ষা-দীক্ষাকে পছন্দ করা হত না। তা-ও কেবল ধর্মীয় কিতাবাদী, প্রয়োজনীয় মাসয়ালা-মাসয়েল জানা এবং গৃহস্থলী কাজের ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। হকপন্থী উলামায়ে কিরামের কিতাবাদী যারা এ বংশের আকীদা-বিশ্বাস ও মতাদর্শের সাথে একমত ছিল, তা এধরনের পাঠ্যভূক্ত ছিল। আমি আম্মাজানের মুখে যেসব কিতাবের নাম বেশি শুনেছি, তন্মধ্যে হযরত কাযী ছানাউল্লাহ পানিপতি রহ. রচিত কিতাব মালাবুদ্দাহ মিন্হ, (আকাইদ ও মাসাইল সম্পর্কে) রাহে নাজাত, হযরত শাহ রফীউদ্দীন রহ. দেহলবী রহ. এর কিতাব কিয়ামতের আলামত প্রসঙ্গে "চেহেল হাদীস (চল্লিশ হাদীস)", শাহ আব্দুল কাদের ও শাহ রফীউদ্দীন রহ. এর তরজমা কুরআন এর কথা আমার স্মরণ আছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে ফার্সীও পড়ানো হত। কিন্তু হাতের লেখা সুন্দর করার ব্যাপারে তেমন একটা প্রেরণা/সাহস দেওয়া হত না বরং তা একরকম অপছন্দ করা হত। কোনো কোনো বুযুর্গ তো এ বিষয়ে বড় কঠোর ছিলেন। বলতেন, মেয়েরা লিখা শিখলে তো অন্যদেরকে চিঠিপত্র লিখতে শুরু করবে। কিন্তু

আম্মাজানের লিখা এবং লিখা সুন্দর করার প্রতি বিরাট আকর্ষণ-আগ্রহ ছিল। তিনি তাঁর বড় চাচাতো ভাই মৌলভী সাইয়িদ খলীলুদ্দিন সাহেবের কাছে– যিনি পুরো বংশে একজন মান্যবর ব্যক্তি ছিলেন, এর অনুমতি চাইলেন। তিনি তার (আমার আম্মাজানের) আকাঙ্ক্ষা এবং তার দ্বীন-ধর্মীয় অবস্থাচিত্র দেখে প্রয়োজন পরিমাণ এর অনুমতি দেন। আর এতে আমার আম্মাজান তার পরিবেশ-পরিবারের রেওয়াজ এবং আপন বংশের মাপকাঠির বিপরীত বিশেষ মানের হস্তলিখন শিখে ফেলেন। এ বিষয়টি তাকে তার রচনা, গ্রন্থনা ও সংকলনের কাজে বিরাটভাবে সাহায্য করেছে।

যে কিতাবগুলো তিনি সে সময় সবচেয়ে বেশি পাঠ করতেন এবং তার জীবনে ও তার মানসিকতায় গভীর প্রভাব পড়েছে যে কিতাবগুলোর, তন্মধ্যে কাসাসুল আম্বিয়া, মাকাসিদুস বারাযিখ, তরীকুন্ নাজাত এর নাম আমি বারবার শুনেছি। কিছুদিন পর আরও তিনটি কিতাব তার মুতালায়ায় (পাঠে) আসে। সেগুলোর দ্বারাও তিনি বিরাটবাবে প্রভাবিত হোন। একটি নবাব সিদ্দীক হাসান খান রহ. এর রচিত الداء و الدواء (রোগ ও চিকিৎসা) গ্রন্থখানা। যার দ্বারা তিনি বিভিন্ন আয়াতে কারীমার বৈশিষ্ট্য এবং কুরআনিক আমলসমূহ জানতে পারেন। তন্মধ্যে তিনি অনেকগুলো বিষয় নিজের মা'মুল বা নিয়মিত আমল হিসেবে গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় কিতাবটি مجربات دیربی এর দ্বারাও তিনি প্রচুর উপকৃত হয়েছেন এবং কাজ করেছেন। তৃতীয়টি হল تعبیرالرویا (স্বপ্নের ব্যাখ্যা)। এ কিতাবে সেসব স্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে, যেগুলো মুহাম্মদ ইবনে সীরীন মানুষের বিভিন্ন স্বপ্নের প্রেক্ষিতে দিয়েছেন এবং তার মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। আম্মাজানের এই কিতাব অধ্যায়ন, নিজের অভিজ্ঞতা এবং আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদানের সাথে তার বেশ সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। বংশের অধিকাংশ লোক তার কাছে নিজ নিজ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করত। আর তাঁর (অর্থাৎ আম্মাজানের) প্রায় ব্যাখ্যাই সঠিক প্রমাণিত হত।

সে দিনগুলোতেই একটি বিরাট নেয়ামতের মতোই মরহুম হাতেফ এর একটি মুনাজাতে মানযুম (কাব্যিক প্রার্থনা) তার হস্তগত হয়। যার নাম ছিল নেয়ামতে উয্মা। এর প্রত্যেকটি কবিতাই "আসমায়ে হুসনা" এর কোনও একটি নাম দ্বারা শুরু হয়েছে। আর উক্ত নামের সামঞ্জস্য ও মিল রেখেই সকল বর্ণনা ও মুনাজাত হয়েছে। জানা নেই কে ছিলেন এই হাতেফ? আর তার পূর্ণ নামই বা কি ছিল? কিন্তু আমাদের বংশের জন্য এ হাতেফ অদৃশ্য মানব প্রামণিত হয়। তার এই মাকবুল মুনাজাতের প্রতিটি শব্দে শব্দে খুলূছ-

একাগ্রতা, ও দু'আর খাঁটি জযবা ও মনের গহীন থেকে আবেগের ঝরণাধারা ঠিকরে পড়ত। বংশের স্ত্রী-কন্যা ও মেয়েরা এমনকি অনেক পুরুষের জপ ও অযীফা হয়ে গিয়েছে মুনাজাতটি। প্রায় লোকেরই তা মুখস্ত ছিল। বিশেষত যখন কোনও দুঃশ্চিন্তা-পেরেশানীর বিষয় হত কিংবা কোন দুঃখ-যাতনা ও কষ্টের ঘটনা ঘটত, তখন এই মানুজাত ব্যক্তিগত কিংবা সম্মিলিতভাবে অত্যন্ত দরদ নিয়ে পড়া হত। এতে মনে বিরাট প্রশান্তি ও শক্তি সঞ্চার হত।

কুরআন হিফয

পুরুষদের মধ্যে হিফযে কুরআনের রেওয়াজ তো আমাদের বংশে আগে থেকেই ছিল। সব যুগেই বড় বড় সুদক্ষ হাফেযে কুরআন হয়েছে। কিন্তু নারীদের মধ্যে আমার জানা মতে ইতোপূর্বে কোনও হাফেযে কুআন ছিল না। আল্লাহ তা'আলাই জানেন, কী এমন জোয়ার ওঠল– যার ফলে এ শ্রেণীর মধ্যে কুরআনে কারীম হিফয করার অদম্য বাসনা জন্ম নিল। আমি বলছি না যে সর্বপ্রথম আম্মাজানেরই এ আগ্রহ জন্মেছে কিংবা তারই অপর কোনও বোন বা প্রিয়জনের! কিন্তু সে সময় আমার আম্মাজান এবং তার অপর এক বোন সালেহা বি, তার ভাতিজি আরও দু'জন মুসলমান বোন কুরআনে কারীম হিফয করতে শুরু করলেন। তাদের প্রত্যেকেই নিজের কোনও আপনজনের কাছে হিফয শুরু করেছেন. যে ছিল তাদের সহোদর ভাই কিংবা মাহরাম অন্য কেউ। ছোট মামা সাইয়িদ উবাইদুল্লাহ সাহেব খুব ভাল হাফেয ছিলেন। অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও চমৎকার কুরআন পড়তেন। আম্মাজান তার কাছেই হিফয শুরু করলেন। এ দুই ভাই-বোনের মধ্যে অনেক স্নেহ-মহব্বত ছিল। আমি খুব কম ভাই-বোনকেই পরস্পরে এমন নিবেদিতপ্রাণ পেয়েছি। যেমন ছিলেন এ দুই ভাই-বোন। সম্ভবত চার/পাঁচ বছরের ছোট-বড় ছিলেন তারা। তিন বছরে হিফয সম্পন্ন করে ফেলেন তিনি। আগে-পরে তার সব বোনই হাফেয হয়ে যায়। তাদের বড় আপন চাচাতো ভাই মৌলভী সাইয়িদ খলীলুদ্দীন সাহেব এ ব্যাপারে বিরাট সাহস ও পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন। আম্মাজান বলতেন, মরহুম ভাই সাহেব প্রতি সপ্তাহে আমাদেরকে দাওয়াত করতেন। আর যখন হিফয সম্পন্ন হল, তখন তিনি এক বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

আম্মাজানের রমাযান উদ্‌যাপন

কত পুণ্যময় ছিল সে সময়! তারা সবাই তখন তারাবীহ্ নামাযে এক এক পারা কুরআন পড়তেন। কোন কোন আলেমের ফিকহী সিদ্ধান্ত মতে তাদের নিজস্ব পৃথক জামাত হত। যেখানে নারীই হত ইমাম আর নারীগণই হত মুক্তাদী। ইশার নামাযের পর থেকে সাহরীর প্রায় কাছাকাছি সময় পর্যন্ত এই ধারা চালু থাকত। তারা সকলেই কুরআনে কারীম খুব ভাল পড়তেন। উচ্চারণরীতি ও মাখরাজগুলো ছিল খুবই বিশুদ্ধ। যদি বেয়াদবী না হয়, তবে বলব– আজকের বহু মাদরাসা শিক্ষিত ডিগ্রীধারী মৌলভীদের থেকে তারা অধিক সহীহ এবং উত্তম পড়তেন। তার উপর আত্মিক প্রেরণা, মনের আকুলতা, স্বভাবগত সুরতরঙ্গ ছিল চমৎকার। আমার মনে পড়ে, একবার আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আম্মাজানের কুরআন তিলাওয়াত শুনছিলাম। তিনি তখন তারাবীহ্ পড়াচ্ছিলেন। আমার কাছে মনে হচ্ছিল, যেন আকাশ থেকে বারিপাত হচ্ছে। সেই স্বাদ আজও ভুলতে পারি না। আম্মাজান বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর আব্বাজানকে কুরআন মাজিদ শুনিয়েছেন। ফলে তার মধ্যে আরও দহন সৃষ্টি হয়। শেষ বয়স পর্যন্ত যতদিন তার স্মৃতিশক্তি কাজ করত, ততদিনই তিনি আপন ভ্রাতুস্পুত্র হাফেয সাইয়িদ হাবীবুর রহমান সাহেবের সাথে নিয়মিত দাওর করতেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নিজের নিয়মিত আমলগুলো করে গেছেন। বিভিন্ন সূরা, বিভিন্ন রুকু ও আয়াতগুলো অত্যন্ত বিশুদ্ধরূপে আর বিশেষত তাজবীদ এবং বিশুদ্ধ মাখরাজ উচ্চারণসহ সমান পড়ে যেতেন।

নিঃস্বতা ও অসহায়ত্ব, দু'আ ও মুনাজাতের আকুলতা

এবার সে মুহূর্তগুলোর কথা বলব, যখন আল্লাহ পাক তাকে আপন কুদরতের বিশেষ নেয়ামতে সম্মানিত করেছেন। দান করেছেন তাকে দু'আ ও মুনাজাতের সেই অমূল্য ধন-রত্ন; যা তার কবূলিয়াত, গ্রহণযোগ্যতা ও উন্নতির মৌলিক গুণ। আর সহস্র সৌভাগ্য ও নেয়ামতের মাধ্যম এবং উৎসমূল হয়েছে। যার দৃষ্টান্ত আমি এই শেষ যুগে কেবলই আল্লাহর একান্ত খাছ বান্দা এবং আকাবির ও মাশাইখে কিরামের মধ্যে দেখেছি।

প্রায়ই দেখা গেছে, যখন কাউকে আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ দানের ইচ্ছে হয় এবং আল্লাহ তাআলা কাউকে নিজের কাছে টেনে নিতে চান–প্রিয়পাত্র বানাতে চান, তখন কোন না কোন উপায়ে তার মধ্যে নিঃস্বতা, অসহায়ত্ব, অস্থিরতা, দহন-জ্বালা ও আকুলতা সৃষ্টি করে দেন। শত-সহস্র সুখ-

শান্তি কুরবান এই অস্থিরতা-আকলতার উপর– যা সব কিছু থেকে সরিয়ে এনে আল্লাহর দরবারে দাঁড় করিয়ে দেয়। সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে জুড়ে দেয় তার সাথে সুসম্পর্ক। এ অধম গুনাহগারকে আল্লাহ তা'আলা অনেক বুযুর্গানে দ্বীনের জীবনচরিত ও জীবনকর্ম লেখার অনন্য সুযোগ্য দিয়েছেন। প্রায়ই দেখেছি, যার উপর বিশেষ সাহায্য ও করুণা হয়েছে, তার জীবনে অস্থিরতা ও দহন-জ্বালার কোনও কারণ সৃষ্টি করে তাকে সবার মাঝ থেকে উঠিয়ে এনে আপন বানিয়ে নেন। অনেক বুযুর্গের জীবনের গতিধারা বদলে যাওয়া, অবস্থার পরিবর্তন এবং ধ্যান-সাধনার মাধ্যমও এই দহন-জ্বালাই হয়েছে। যাকে অনেকেই "ইখতিলাজ" (আত্মবিস্মৃতি) নামে অভিহিত করেন। আম্মাজান প্রায়ই বলতেন– আমি একবার কুরআনে কারীম পড়ছিলাম। সহসা আমি নিম্নোক্ত আয়াতখানা লক্ষ্য করলাম–

وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب – أجيب دعوة الداع إذا دعان
فليستجيبوا لى وليؤمنوبى لعلهم يرشدون

"যখন আমার বান্দা তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বলে দাও) আমি নিশ্চয় (তার) সন্নিকটে। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করি, যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। কাজেই তারা যেন আমার হুকুম পালন করে এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। যেন তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৬)

অনেকবারই হয়তো এ আয়াতে কারীমা পড়েছি। আর সম্ভবত তখন কুরআনের হিফযও সম্পন্ন করে ফেলেছি। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার চোখ একেবার খুলে গেল। মনে হল, যেন কোনও হারানো বস্তু ফিরে পেয়েছি। আবিষ্কার করেছি নতুন কোনও তত্ত্ব। আম্মাজন বলতেন, মনে হচ্ছিল যেন কেউ মনের পাতায় কিছু লিখে দিয়েছে। কোনও জিনিস মনের গহীনে পরতে পরতে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। ব্যাস, আর কি? আমি যেন কোনও রত্নভাণ্ডার পেয়ে গেলাম। সব তালার চাবিই হাতে এসে গেল। সুতরাং একেই দৃঢ়হস্তে আকড়ে ধরলাম। দাঁতে কামড়ে রাখলাম। দু'আ ও প্রার্থনার এমন আকুলতা সৃষ্টি হল, যেন গোটা অস্তিত্ব জগত তাতে অভিভূত হয়ে গেল। অপরদিকে শুরু হল আত্মবিস্মৃতি। একধরনের নিঃস্বতা, শূন্যতা, আকুলতা, অস্থিরতা সব সময় পীড়িত করতে লাগল। জীবনের পরিণতি, ভবিষ্যতের উদ্বেগ-চিন্তা, সৌভাগ্য ও সাফল্যের আশা-আকাঙ্ক্ষা সব সময় মনেপ্রাণে আচ্ছন্ন থাকত।

এই সার্বক্ষণিক অস্থিরতা, আকুলতা ও দহন-জ্বালায় যদি কোনও কিছুতে প্রশান্তি আসত, তবে তা কেবল দু'আ ও প্রার্থনায়। এটা ছিল ব্যথার উপশম। পোড়া ক্ষতের আশু মলম এবং আত্মার খোরাক। ছিল এক বাতেনী ও আত্মিক শক্তি। যা তাকে সর্বদা দু'আ ও মুনাজাতে লিপ্ত রাখত। নিজেই অস্থির-আকুল করে তুলত। তারপর নিজেই দিত সান্ত্বনা। নিজেই মনকে পোড়াত, করত ক্ষত-বিক্ষত। আবার নিজেই তার উপর লাগাত পট্টি-মলম। নিজেই কাঁদাত। ফের নিজেই মুছে দিত নয়ন অশ্রু, ভেজা চোখ। দু'আ করে, কেঁদে কেঁদে কিছু সময় কেটে যেত। তারপর বুকের অধরে শুরু হত তোলপাড় আর আহত হৃদয়রকে আবারও বেশ বিধ্বস্ত করত। যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি মন খুলে মুনাজাত করে নিতেন, তার অস্থির প্রাণ স্বস্তি পেত না।

তার প্রত্যেক দু'আর প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস এবং মহান আল্লাহর রহমত (দয়া-করুনার) উপর বেশ সুখ সন্তুষ্টিও ছিল। ভাল ভাল লোকদের মধ্যে আমি দু'আর এই আগ্রহ-আবেগ এবং দু'আতে এমন আস্থা-বিশ্বাস দেখি নি, যেমনটি দেখেছি আমার আম্মাজানের জীবনে। সেই হাদীসে রাসূল সা. এর বাস্তব দৃষ্টান্ত ছিল তার জীবন, যাতে বলা হয়েছে– তোমাদের হাড়ি-পাতিলের লবণ যদি কম পড়ে যায়, তবে তা দু'আরই মাধ্যমে কামনা কর। তোমাদের জুতার ফিতাও যদি ছিঁড়ে যায়, তবে তা-ও আল্লাহ তা'আলার কাছেই প্রার্থনা কর।”

তার গোটা জীবন দু'আ ও মুনাজাতের মধ্যে কেটেছে। সুন্নাত দু'আসমূহ, কাব্যিক মুনাজাত উঠতে-বসতে, শয়নে-জাগরণে প্রত্যেক চিন্তা ও আশঙ্কার মুহূর্তে পড়তে থাকতেন। শৈশব থেকেই আমাদের ভাই বোনদেরকে এর অভ্যস্ত বানিয়েছেন। আমার স্মরণ আছে, আমি যখন সামান্য লিখতে-পড়তে শিখলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন– যখন তুমি কিছু লিখবে, তখন বিসমিল্লাহর পরে সর্বপ্রথম এ বাক্যটি লিখবে-

أللهم اتنى بفضلك أفضل ما توتى عبادك الصالحين

(হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নিজ অনুগ্রহে সর্বোত্তম-সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু দান করো। যা তুমি তোমার নেককার পুণ্যবান বান্দাদের দান করে থাক।)

তার প্রতি মুহূর্তের এত দু'আ এবং সুন্নাত ওযীফা মুখস্ত ছিল, যা বহু মাদরাসার ভাল ভাল ডিগ্রিধারী গ্রাজুয়েটদের (মৌলভীদের) অনেকেরই হয়তো মুখস্ত নেই। তার এই কবিতা একদম বাস্তব এবং তার আসল আগ্রহ-আকর্ষণের ব্যাখ্যদান করে। (তিনি বলেন–

تیرا شیوہ کرم ہے اور میری عادت گدائی کی
نہ ٹوٹے آس اے مولا تیرے در کے فقیروں کی

[তুমি তো অসীম দয়ালু মহান
আমি বড় দীন হীন ভিখারী,
আশাহত করো না মাওলা!
এ যে ভগ্ন-কাতর মনভারী।]

তার এ কবিতাই প্রমাণ করে তার ব্যাকুলতা, সে কি মনোত্তাপ! আমি এগুলো অধিকাংশ মুলতাযিম ও মাতাফে (অবস্থানকালে) পড়েছি। অনুভব করেছি বিরাট আকর্ষণ ও উপকারীতা–:

کونسی سرکار ہے جس کا ہے سب کو آسرا
کونسا دربار ہے جس میں ہے ہر کوئی کھڑا-

کونسا وہ شاہ ہے جس کا ہے ہر کوئی گدا
کونسا درہے نہ جس در سے کوئی خالی پھرا-

اج اسی سرکار سے میں بھی تو پاکر شاد ہوں
اج اسی سرکار سے میں بھی توخوش ہوکر پھروں

(কোথায় সে সরকার আশ্রয় যে সবার; কোথা
সে দরবার, যে কেউ দাঁড়িয়ে হেথায়?
কোথা সে বাদশা, সকলেই যার প্রজা; কোথা সে দুয়ার,
যেথা হতে ফেরে না কেউ শূন্য হাত?
আজ আমিও তো সে সরকার থেকে কিছু পেয়ে হব সুখী।
আজ আমিও তো সে দুয়ার থেকে ফিরব হয়ে খুশি)।

দু'আয় তার মুখ থেকে আল্লাহ তা'আলা এমন সব বাক্য বের করতেন, যা ঈমান-ইয়াকীনের অধিকারী অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মিক শক্তি সম্পন্ন লোকদের বৈশিষ্ট্য। মানসিকতা প্রথম থেকেই ভারসাম্য স্বাভাবিকতা ছিল। এছাড়া বিভিন্ন মাসনূন দু'আ এবং অকুণ্ঠ অবস্থা বর্ণনা ইত্যাদি। যা কিছু তাহাজ্জুদ নামাযে ও ফরয নামাযগুলোর পর সাধারণত তিনি পেশ করতেন, অধিকাংশ কাব্যাকারে মহান আল্লাহর দরবারে নিজের চাওয়া-পাওয়াগুলো উপস্থাপন করতেন। ফরিয়াদ জানাতেন আপন প্রতিপালক ও মালিকের সামনে।

এসব মুনাজাত দরূদ ও সাহাবায়ে কিরামের কৃত দু'আ-ইস্তিগফারে পরিপূর্ণ থাকত। খুব দ্রুত মাকবুল এবং মুখে মুখে চালু হয়ে যেত। বংশের নারী ও মেয়েরা সেগুলো মুখস্ত করে নিত। পড়ত নিয়মিত। যে সময় এসব মুনাজাত পড়া হত, একটি নূরানী পরিবেশ তৈরী হত তখন। ভরে যেত সকলের মন। বেশ কিছুদিন পূর্বে তার সেসব মুনাজাত সমগ্র "বাবে রহমত" দেখে জনৈক সাহেবে দিল (হৃদয়বান) ও আরেফ (আল্লাহওয়ালা) বলেছিলেন– এ কবিতাগুলো যার, তার আপন মালিকের প্রতি এক সুখ-সন্তুষ্টি এবং তার সঙ্গে আনুগত্যের একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয়। স্বয়ং আমিও যখন সে দু'আগুলো পড়ি, তখন নিজের মধ্যে এক বিশেষ অবস্থা অনুভূত হয়। মন-মানস দু'আর প্রতি আর নিবিষ্ট হয়।

আম্মাজান স্বয়ং নিজের একটি রচনায় সে সময়কার অবস্থা তুলে ধরেছেন। তদপেক্ষা বেশি সঠিক ও উত্তম ব্যাখ্যা আর হতে পারে না। (তিনি লিখেন), "দুআ যেন আমার আহার্য ছিল। দুআ ছাড়া আমার তৃপ্তি আসত না। দু'আর মগ্নতা এক সময় এত বেড়ে গেল যে, তাতে আমার সকল কর্মব্যস্ততা ছুটে গেল। তখন কথা বললেও দু'আর সাথে বলতাম। কোনও মুহূর্ত দু'আ ছাড়া নীরব কাটত না। জুমআর দিনটি যেন ঈদের দিন ছিল। আর বাস্তবে ঈদের দিনও আছে। গোটা দিন দু'আ করে করে কাটাতাম। বিশেষত আসর নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নির্জন-নিভৃতে বসে দু'আয় এমনভাবে লিপ্ত থাকতাম, যেখানে চোখ তুলেও দেখতাম না কোনও দিকে। মোরগের প্রত্যেক ডাকে, প্রত্যেক আযানের সাথে দু'আ করতাম। যথাসম্ভব দু'আর কোনও মুহূর্ত নষ্ট করতাম না। কোনও বিষয় বাদ রাখতাম না। সর্বপ্রকার ভয়-আশঙ্কা থেকে নিরাপত্তা চাইতাম। কামনা করতাম প্রত্যেক সৌন্দর্য ও কল্যাণ। কী ছিল সেই প্রকৃত মহান মালিকের রহমত ও সাহায্য! জীবনে যতসব বিষয় আসন্ন ছিল, সবই দুআর মুহূর্তে সম্মুখে থাকত। আবেগ-উত্তেজনা এতই বেড়ে যেত যে, আত্মবিস্মৃতির অবস্থা হয়ে যেত। সব জায়গা অশ্রুসজল হয়ে ওঠত। তার মহান কুদরতের বাহার দেখে ছটফট করত মন, যেভাবে যবাই করা মোরগ ছটফট করে। তবু আত্মবিস্মৃতি অবস্থায় দু'আ চালু থাকত। সব সময় নিজের অবস্থানের উপর ঘৃণা করতাম। বলতাম– "যে ক্রুটি রয়েছে ভাগ্য-নিয়তির মিটিয়ে দাও সব, জগৎ-সংসারে তোমারই হবে নাম।"

সিজদা থেকে কখনও মাথা উঠাতাম না। যাবৎ না মনে খানিক প্রশান্তি আসত। দু'আর পরে আমার এত তৃপ্তি ও সুখ অনুভূত হত, যেন অবারিত

রহমতের দরজা খুলে গিয়েছে। আর আমি রহমতের রত্নভাণ্ডার লুটে নিচ্ছি। কখনও এমনিতেই হাসি আসত আর বলে উঠতাম–

کیوں نہ آئے رحم تجہ کو حال پر میرے رحیم
تیری ہی رحمت تو ہے مونس میری ہمدم مری

بیکسوں کابس توہی مونس توہی غمخوار ہے
تجہ سے کہ کر کیوں نہ ہو بیتائی دل کم مری

کب نہیں ہوگی خبر تجہ کو دل بیتاب کی
آہ یہو نچے گی تیرے دربار میں جسدم مری

سائلوں میں اک ترے دربارکے میں بہی تو ہوں
کیوں رہے فریاد دل یودرہم و برہم مری

کیوں نہ میں چاہوں کہ خودہی چاہنے والا ہے تو
کب گوارہے تجہے کہ چشم ہو پرنم مری

দু'আর ধ্যান-তন্ময়তা ও মনোযোগ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল। এতে তার অভাবনীয় স্বাদ-আনন্দ, আবেগ-উচ্ছাস ও আত্মহারার অবস্থা অনুভূত হত। সে দিনগুলোতে তার ভারসাম্যপূর্ণ মানসিকতা ও মনোত্তাপ তাকে কবিতার মনও দান করেছে। তিনি তার মনের ব্যাকুলতাগুলো কাব্যাকারে ব্যক্ত করে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতেন। তিনি বলেন–

"ঐ প্রকৃত মালিকের কাছে আমার আকুল মুনাজাত ও কান্নাকটি অনেকটা এরূপ পছন্দ হল, তিনি যা কিছু দিতেন, কাঁদিয়ে দিতেন। তবে সবচেয়ে উত্তমটা দিতেন। এক বৎসর পর্যন্ত যথারীতি এই লিপ্ততা থাকে। এতে এমন আগ্রহ-আকর্ষণ হয়ে গেল যে, দু'আ অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কিছুই রইল না। সকল সৌন্দর্য, ধন-রত্ন তুচ্ছ হয়ে গেল। দু'আয় এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম, প্রায় নামাযে সূরা পড়ার স্থলে দু'আ প্রার্থনা শুরু করতাম আর কাজকর্মের কথা কি বলব! ঐ প্রকৃত মালিক দু'আর প্রতি এমন আাকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন, ফলে দু'আ ছাড়া আমার স্বস্তি আসত না। যখন নামায ও দু'আ থেকে অবসর হতাম, তখন "হিযবুল আযম" এর জপ করতাম। পুনরাবৃত্তি করতাম বারবার। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দু'আ থেকে উদাসীন হতাম না। মুখেও পড়তাম আবার কলমেও লিখতাম। মন এর প্রতি যারপরনাই আকৃষ্ট ছিল। ফলে এমনিতেই মুখে এমন এমন কবিতা-ছন্দ উচ্চকিত হত, যেন তা সংশোধিত-সম্পাদিত। অত্যন্ত বিনয়-নম্রতার সাথে

কবিতাগুলো পড়তাম আর কাঁদতাম। ঐ প্রকৃত মালিকের কুদরত ও রহমতের প্রতিই বেশি ভরসা ছিল, ভাগ্যকে একেবারেই তুচ্ছ জ্ঞান করতাম। তাকেই মহান কার্যনির্বাহী মনে করে সব সময় আনন্দ আপ্লুত হতাম। সহজ মনে করতাম সকল মুশকিল-কাঠিন্যকে। এমন সব আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতাম, যা আমার ভাগ্য হতে সুদূর পরাহত ও কঠিন ছিল। কিন্তু তার মাহাত্ম্য-বড়ত্বের প্রতি লক্ষ্য করে বলতাম–

ذرا کو گر چاہے تو ہی پل میں کرے رشک قمر
تیری صدفت یہ دیکھ کر کیوں حوصلہ میرا ہو کم

"তুমি চাইলে পলকেই করতে পার অণুকেই ঈর্ষা চাঁদের। তোমার এই গুণ দেখে কেন আমার চেতনা সাহস হবে কম।"

তার সাহায্য-প্রীতি আমার এত সুখ ছিল, ফলে বলতাম– "হে আরহামুর রাহিমীন। তুমি যদি আমার নিজের নির্ভৃত সাধনায় সফল না কর, তবে আমি এমন জোরে চিৎকার করব, যেন আকাশ-মাটি কেঁপে উঠে। আর তোমার দুয়ার থেকে কখনও মাথা উঠাব না।"

نہ اٹھوں گی میں اس در سے کوئی مجھ کو اٹھا دیکھے
مجھے ہے آرزو جس کی اٹھوں گی میں وہی لے کر

"উঠব না আমি তার দুয়ার থেকে। কেউ উঠিয়ে দেখুক মোরে। যে আশায় বেঁধেছি বুক। ওঠব আমি তা-ই নিয়ে।"

এ ছিল তার অপার করুণা, মহব্বত ও রহমত, যা আমাকে এত বড় দরবারে ধ্যান-তন্ময় ও আদামস্তক নিবিষ্ট করে দিয়েছিল। আমি অকুণ্ঠ কথা বলতাম এবং বলে বলে নিজের কথায় মুহ্যমান হয়ে যেতাম। আর এত বড় বাদশা রাজাধিরাজ হয়ে আমি নগন্য দীনকে প্রীতিডোরে বেঁধে রাখতেন।

یہ شان دیکھی تری نرالی جو مانگے تجھ سے تو اس سے راضی
بلا کے دینا کرم ہے تیرا ، یہ فضل بھی ہے ، کمال بھی ہے

"কেবল তোমাতেই দেখেছি এ মাহাত্ম্য, চাইল যে, তোমার কাছে, তার প্রতি সন্তুষ্ট তুমি, সুখ-দুঃখ তোমারই কৃপা, তোমারই করুনা-মহিমা।"

বিবাহ

একদিন আম্মাজানের বিয়ের বয়স হয়ে গেল। তার সমবয়সী কয়েক বোন ও সখীদের বিয়েশাদী হয়েও গিয়েছিল। কিন্তু তার বিয়ের ব্যাপারে তার বাবা-মা (আমার নানা-নানী) তখনও কোনও সিদ্ধান্ত করতে পারছিলেন না।

পাত্র ঘরেই ছিল বর্তমান। আপন ছোট চাচাত ভাইয়ের কাছে সহোদরা বোন বিবাহিতা ছিলেন। যিনি ছিলেন বড়জনের ছোট। এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে তিনি যৌবনেই ইন্তিকাল করেন। এখন দ্বিতীয় বোন (আম্মাজান) এর বিয়ের প্রস্তাব করা হল। চাচার সে ঘরে বিদ্যমান ছিল সর্বপ্রকার পার্থিব যশ-খ্যাতি, ধন-সম্পদ, জমি-জেরাত, নানা আসবাবপত্র ও বিলাস সামগ্রী। কিন্তু দীন-ধর্মের বিশেষ কোনও আগ্রহ এবং উচ্চ দীনী শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা সেখানে ছিল না। সকল উপকরণ আর ইঙ্গিত-সমর্থনও ছিল এ বিয়ে হয়ে যাওয়ার পক্ষে। কারণ, এটা ঘরের মধ্যেই নতুন ঘর ছিল। দূরে কোথায় যাবে? ধন-সম্পদ আর ব্যবস্থাপনাও ছিল যৌথ। বসবাসও ছিল একই সীমানায়; একই ঘরে। নানী সাহেবাও এর বিরাট সমর্থক ও পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন রকম। ইত্যাবসরে একটি অদৃশ্য রহস্য উন্মোচিত হল।

আমার আব্বাজান মাওলানা হাকীম আব্দুল হাই রহ. এর প্রথম বিবাহ হয়েছিল ১৩০৯ হিজরীতে আপন মামাত বোনের সঙ্গে ফতেহপুর হেস্‌সু জেলায়। উভয়পক্ষের মধ্যে অত্যন্ত মহব্বত ও মিল ছিল। ১৩১৯ হিজরীতে লক্ষ্ণৌতে তার আকস্মিক ইন্তিকাল হয়ে গেল। রেখে গেলেন কেবল স্মৃতিচারণকারী আমার বড় ভাই মরহুম মাওলানা হাকীম সাইয়িদ আব্দুল আলী সাহেবকে। তিনি তখন ছিলেন মাত্র নয় বছরের কিশোর। আব্বাজানের উপর এই আকস্মিক ঘটনায় এতই প্রভাব পড়ে, ফলে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে না-করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। অথচ তখন তার বয়স মাত্র তেত্রিশ বছর। আমার বড় দাদা মাওলানা হাকীম সাইয়িদ ফখরুদ্দীন রহ. এবং আমার নানা সাহেব দু'জনেই হযরত মাওলানা সাইয়িদ খাজা আহমদ সাহেব নাসিরাবাদীর সিলসিলায় হৃদ্যতা, আত্মীয়তা ও বংশগত সম্পর্ক ছাড়াও পীর ভাই ছিলেন। তাদের মধ্যে পরস্পর বেশ আন্তরিকতা ও মিল ছিল। এই আকস্মিক ঘটনার পর তাদের মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা হল আব্বাজনকে দ্বিতীয় বিয়ে করানোর। অনন্তর আব্বাজানের দ্বিতীয় বিয়ে হয় হযরত শাহ যিয়াউন নবী সাহেবের বিবাহযোগ্য কন্যা (আমার আম্মাজান) এর সাথে। যিনি নিজের দীনদারী, ধার্মিকতা, রুচিবোধ, বুদ্ধিমত্তা ও লেখাপড়ার আগ্রহের কারণে দাদা সাহেবের অত্যন্ত স্নেহের মেয়ে ছিলেন। কিন্তু আব্বাজানের মন-মানসিকতা বিয়ের প্রতি মোটেও আগ্রহী ছিল না। পরম সৌভাগ্য সত্ত্বেও তার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে বরাবরই নীরবতা ছিল। আমাকে তাঁর এক নেহাৎ অকৃত্রিম ও ঘনিষ্ট বন্ধু মরহুম মুনশী আব্দুল গনী সাহেব একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি একবার রায়বেরলী গেলাম। হাকীম সাহেবের আব্বা মাওলানা

ফখরুদ্দীন সাহেব আমাকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে বললেন– আমার বংশই কি এখন প্রদীপহীন হয়ে যাবে? সাইয়িদ (বংশের মধ্যে আব্বাজান এনামেই পরিচিত ছিলেন) বিয়ে করতে চায় না। আমাদের পরে এ ঘরে আলো দেওয়ারও কেউ থাকবে না। তুমি সাইয়িদকে এ ব্যাপারে রাজি করাও। আমি লক্ষ্ণৌ এসে মৌলভী সাহেবকে বললাম– আপনার আব্বাজানের খুবই ইচ্ছে এবং আকাঙ্ক্ষা যে, আপনি দ্বিতীয় বিয়ে করবেন। আপনি অস্বীকার করলে তার অসন্তুষ্টির আশঙ্কা আছে। অবশেষে আমার আব্বাজান তার পিতার মন রক্ষা, আনুগত্য ও নির্দেশ পালনার্থে (দ্বিতীয় বিয়ের জন্য) রাজি হয়ে গেলেন। তারপর নানাজীর কাছে প্রস্তাব পাঠিয়ে দেওয়া হল।

এখানে আরেকটি কথা বলে রাখাও জরুরী। আমার নানা বাড়িতে যেভাবে সবচেয়ে বেশি ভাল পানাহার ও স্বচ্ছলতা, ধন-সম্মান ছিল, ঠিক তদ্রুপই আমার শ্রদ্ধেয় দাদার ঘরে এসবের কমতি ছিল। এখানে যুগ যুগ ধরে তেমন কোনও অর্থ-সম্পদ ও জমিদারী ছিল না। বংশের এই শাখায় অনেক পূর্ব থেকে ইলমে দ্বীনের ক্রমধারা চলে আসছিল। এটা মৌলভী বাড়ি বলেই প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে ধন-সম্পদের পরিবর্তে কিছু কিতাবাদী সঞ্চয়-স্তুপ আর ধর্মীয় জ্ঞান, দ্বীনী ইলম বংশনানুক্রমে হাতে হাতে স্থানান্তরিত হতে থাকে। এটাই ছিল এ বংশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। বিশেষত সে সময় ঘরে একধরনের দীনতা-হীনতা ও দারিদ্র্য বিরাজ করছিল। দাদাজান ছিলেন একজন সুবিজ্ঞ উদার ডাক্তার, বড় পণ্ডিত ও লেখক। কিন্তু মন-মানসিকতায় অমুখাপেক্ষীতা, আত্মতুষ্টি ও আত্মনির্ভরতা ছিল পুরোপুরি। কখনও জীবন-জীবিকার প্রতি মনোযোগ দেন নি। ঘরে কখনও কখনও খাবার কিছু না-থাকাও বিস্ময়ের তেমন কিছুই ছিল না।

আব্বাজান রহ. নদওয়াতুল উলামার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে প্রথম প্রথম ত্রিশ/চল্লিশ রুপি মাসিক বেতনে কর্মরত ছিলেন। পরে তা-ও ছেড়ে দেন। এমতাবস্থায় যখন তার পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পৌঁছাল নানাবাড়ি, তখন আমার নানী মুহতারামার পক্ষে এ প্রস্তাব মেনে নেওয়া বিরাট কষ্টকর হল। মহিলারা এসব বিষয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও অনুভূতিপরায়ণ হয়ে থাকে। তা ছাড়া এদিকে ঘরেই সুপাত্র আছে। সে ঘর সম্পর্কে ভাল জানা-শোনাও আছে। এমন সম্বন্ধের বিপরীতে এই দ্বিতীয় সম্বন্ধকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টি তার বুঝেই আসছিল না। জেনে বুঝে মেয়েকে এহেন কষ্টে নিক্ষেপ করা তার নিকট কোনও বুদ্ধিদীপ্ত কাজ ছিল না। কিন্তু নানা মহোদয়ের ভারী

মহব্বত ছিল আব্বাজানের প্রতি। আব্বাজান তার কাছ থেকে আত্মশুদ্ধি এবং আত্মার খোরাকও নিয়েছিলেন। তিনি আব্বাজানের শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞান-যোগ্যতা সম্পর্কেও ছিলেন অবগত। বিয়ের প্রস্তাব আসতেই তিনি বিগলিত হয়ে গেলেন। যেন তার দীর্ঘ মনোবাসনা পূর্ণ হল। মুহতারাম নানীকে তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন– সাইয়িদ বয়সে তরুণ, পুণ্যবান, সৎকর্মশীল, আলেম এবং ভদ্র-গুণী পুরুষ। আমি কাউকে তার উপর অগ্রাধিকার দিতে পারি না। আমার নিকট দীনতা আর ধনাঢ্য এর কোনও গুরুত্ব নেই। মূল দেখার জিনিস যোগ্যতা ও ইলম।

স্বয়ং আম্মাজানের ভাষায়ই শুনুন। তিনি স্বরচিত "আদ্-দু'আ ওয়াল-কাদর" গ্রন্থে লিখেছেন– "যে পক্ষ থেকে বেশি চেষ্টা ছিল, সেটি আমার চাচার ঘর। আমার দুই বোন সে ঘরে পূর্বেই সম্বন্ধিত ছিলেন। এ ঘর এক সুদীর্ঘ সময় ধরে স্বচ্ছল প্রাণবন্ত ছিল। পার্থিব দিক থেকে সর্বপ্রকার ধনেগুণে ছিল অতুলনীয়। সহায়-সম্পত্তি, মান-সম্মান, লাজ-শরম, রূপ-চরিত্র, এক কথায় এর চেয়ে উত্তম আর কোনও ঘর ছিল না। একে আমাদের জন্য গর্বের কারণ মনে করা হত। মরহুমা আম্মাজানের মনের টান ছিল এদিকেই। নিজের আপন ভাইয়ের ঘর অপেক্ষাও একে প্রাধান্য দিতেন। আর আমারও এ ঘরটি প্রিয় ছিল। সব বিষয়ই ছিল আমার অনুকূলে। কিন্তু মরহুম আব্বাজানের বাসনা ছিল, পাত্র দীন-দরিদ্র যা-ই হোক, তবু হোক মুত্তাকী-পরহেযগার। কিন্তু এ গুণটি সে ঘরে পাওয়া যেত না।"

এই টানাপোড়েন ও দ্বিধাদ্বন্দের মুহূর্তে আম্মাজান, যার সে সময় বিভিন্ন স্বপ্নের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল– তিনি এমন কয়েকটি স্বপ্ন দেখেন, যাতে ইঙ্গিত ছিল মরহুম আব্বাজানের ঘরের দিকে। অধিকন্তু এই দু'ঘর ও পরিবার যদি একাত্ম হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একান্তভাবে বহু সাহায্য করা হবে। এরই পূর্বাপর সময়ে একটি সুসংবাদমাখা স্বপ্ন দেখেছেন। যার দ্বারা তিনি জীবনভর সুখ ও প্রশান্তি অনুভব করতেন। যখন তিনি এর আলোচনা করতেন, তার মধ্যে এক বিশেষ অবস্থা বিরাজ করত। তিনি স্বয়ং লিখেন–

"এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, ঐ পরম করুণাময় অতিশয় দয়ালু দাতা মালিকের একান্ত অনুগ্রহ-সাহায্যে আমি একটি আয়াতে কারীমা পেলাম। সকাল পর্যন্ত সে আয়াতটি মুখে চালু ছিল। কিন্তু এমন কিছু আশঙ্কা ছিল, যা আমি বলতে পারি নি। মুখ দিয়ে বের হওয়া কঠিন ছিল। তার অর্থও আমার জানা ছিল না। যখন তার অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করলাম, তখন আমার মন ভরে

গেল খুশিতে। ভুলে গেলাম চিন্তা-পেরেশানী। আমার এই সৌভাগ্যে বিরাট সুখ ছিল। তা নিয়ে গর্ববোধ করলাম। অনেককেই বললাম এ স্বপ্নের কথা। প্রত্যেকেই শুনে ভারী ঈর্ষা করত। আর মরহুম আব্বাজান এই স্বপ্ন শুনে খুশিতে কেঁদে ফেললেন। সে আয়াতে কারীমাটি ছিল:

فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون

"কেউ জানে না তার জন্য কি লুকায়িত আছে। তাদের জন্য রয়েছে চোখের শীতলতা তার বিনিময়ে যা তারা করত।" – সূরা আস্ সিজদা ঃ ১৭

যাহোক, শেষ পর্যন্ত মুহতারাম নানার সিদ্ধান্ত ও ইচ্ছা অগ্রাধিকার পেল এবং ১৯০৪ খ্রিঃ /১৩২২ হিজরীতে আল্লাহ পাকের অশেষ অনুগ্রহে সুন্দরভাবে এই বিয়ে হয়ে গেল। মুহতারাম দাদাজান এই সম্বন্ধে বিরাট খুশি এবং নিজের পছন্দে ভারী তৃপ্ত ও আনন্দ-আপ্লুত ছিলেন। আম্মাজান ঘরে আসতেই তিনি (দাদাজান) ঘরের সকল ব্যবস্থাপনা এবং আব্বাজানের ছোট বৈমাত্রেয় দুই বোনকে আম্মাজানের হাতে ন্যস্ত করলেন। আর তিনি এবং দাদীজান ঘর-দুয়ার ও বাচ্চাদের ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিন্ত ও স্বাধীন হয়ে গেলেন।

অশেষ কল্যাণের বারিধারা

আম্মাজান তার নতুন ঘরে এসে সে অবস্থাই দেখলেন, যা তিনি শুনতেন। অভাব-অনটনের দিন-রাত। কখনও অনাহার কখনও অর্ধাহার। ঘরে আহারকারী কয়েকজন আর দাদাজানের আয় নামমাত্র। এদিকে নানী তার স্নেহপরবশ স্বভাবত উৎকণ্ঠায় থাকতেন, মেয়ের কোনও কষ্ট হচ্ছে না তো! কখনও কোনও মামাকে বলে পাঠাতেন, ঘরে কোনো কিছু রান্না হল কি না– দেখে এসো! আম্মাজান একাধিকবার শুনিয়েছেন, যখন আমি পিত্রালয় থেকে কাউকে আসতে দেখতাম, তখন চুলায় হাড়ি বসিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিতাম। যেন তিনি মনে করেন খাবার রান্না হচ্ছে। অথচ হাড়িতে পানি ছাড়া কিছুই থাকত না। অনেক সময় নানীজান অভিজ্ঞতায় বিষয়টি বুঝে ফেলতেন এবং খাঞ্চা ভরে খাবার পাঠিয়ে দিতেন। কিছুদিন পরই আব্বাজান ডাক্তারী শুরু করার ইচ্ছা করলেন। আম্মাজান বলতেন, আমার কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন। আমি এর জোরাল সমর্থন করলাম। এরপর ডাক্তারী শুরু হয়ে গেল। এর পর পরই সেই পেরেশানী দূর হয়ে গেল। আয়ের সুব্যবস্থা হল। অতি দ্রুত এত বরকত ও উন্নতি হল, ফলে ঘরের অবস্থাচিত্রই বদলে গেল। একেবারে জীর্ণ-শীর্ণ ঘরটি আম্মাজানের সাহসিকতা ও জীবন্ত প্রাণের ছোঁয়ায় মেরামত শুরু হল। ক্রমান্বয়ে একটি পাকা ঘর হয়ে গেল। দুই বোন এবং ভাই (আব্দুল আলী) সাহেবকে এমনভাবে নিজের

স্নেহ-মমতা ও লালন-পালনে গ্রহণ করেন, যাতে তারা মাকে ভুলে গেল। আর সারা জীবন তারাও তাঁকেই (আম্মাজানকে) মা মনে করেছেন। যে ঘরে স্বয়ং ঘরের লোকদেরই মাঝে মধ্যে অনাহারে থাকতে হত, আজ সেখানে সব ঘর থেকে বেশি মেহমান আসা-যাওয়া শুরু হল। রায়বেরলী ও লক্ষ্ণৌতে নিজের পীর ভাই, স্বজন এবং কাছে-দূরের মেহমানদের আশ্রয় ও ঠিকানা হয়ে গেল।

নিজের ঘরের এই অবস্থাচিত্র, এর বৈশিষ্ট্যাবলী এবং অল্পদিনের মধ্যে এখানে যে অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে, তার আলোচনা স্বয়ং তিনি তার রচনায় লিখেছেন। তার ভাষায়ই সে কথা শোনা যায়। এতে তাঁর প্রকৃত ইচ্ছা-আগ্রহ, রুচি-আকর্ষণ আর মনোত্তাপ অনুভব করা যাবে।

"নিঃসন্দেহে এ ঘরে ধন ছিল না। কিন্তু এমন সব গুণ ছিল, যার জন্য সমস্ত ধন-সম্পদ নিবেদন করা যায়। এক ইলম এমন জিনিস, যা অর্জনের জন্য সম্পদ নিঃশেষ করে দিলেও তার সামান্য মাত্র নসীব হয়। তারপর ইলমের সাথে হাজারও গুণ ছিল। আর সম্পদ তো এমন জিনিস, যার সঙ্গে সহস্র ঝগড়া-বিবাদ থাকে। ঐ প্রকৃত মালিক আমাকে ধনীদের চেয়ে অনেক বেশি সম্মান দিয়েছেন। তিনি আমার উপর এমন সব অনুগ্রহ ও সাহায্য দান করেছেন, যা প্রকাশ করা সাধ্যাতীত। এই স্বল্প আয়ের মধ্যে এমন এমন কাজ করিয়েছি, যা ধনীরা পর্যন্ত করতে পারে না। এমন সব প্রয়োজন পূরণ করেছি, যা কখনও পূর্ণ হওয়ার ছিল না। ঘরের অর্ধেক অংশ দীর্ঘদিন ধরে অসম্পূর্ণ পড়ে ছিল। অনেকেই চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কারও চেষ্টাই সাফল্যের মুখ দেখে নি। তা ছাড়া এর বিয়ে-শাদী ইত্যাদিও কোন ব্যবস্থা ছিল না। রুসম-রেওয়াজকেও জরুরী ধরা হয়েছিল। এক তুচ্ছ পন্থায় জীবন যাপন করছিলাম। এখানে আমি নিজের বিশেষত্ব বয়ান করছি না বরং ঐ প্রকৃত মালিকের কুদরত আর দু'আর মাহাত্ম্য ও বরকত দেখাচ্ছি। সুতরাং মাত্র ক'দিনের মধ্যেই এই ঘর ঈর্ষাযোগ্য হয়ে গেল। না সেই ঘর রইল, না সেই অভাব। সকল প্রয়োজন অত্যন্ত প্রশস্ততা ও সুচারুরূপে পূর্ণ হতে থাকে। অর্ধেক অংশ কি? একটি চমৎকার বৈচিত্রময় প্রসাদ তৈরী হয়ে গেল। যে ঘরে চিন্তা-পেরেশানী ছাড়া আর কিছু ছিল না। এ ঘরকে প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা ধনে-জনে, সন্তান-সম্পদ আর সকল উন্নত গুণাবলীতে ভরে দিলেন। প্রশান্তিময় হয়ে গেল প্রতিটি মুহূর্ত। এ মহান মালিকের এমন কিছু রহমত ও বরকত আমার উপর অব্যাহত অবতীর্ণ হয়েছে, মনে হত যেন রহমতের দুয়ার খুলে গিয়েছে। ঘর হয়ে গেছে জান্নাতের প্রতিচ্ছবি। সকল আশা পূর্ণতায় সজীব হয়েছে। যে চিন্তাধারা, মন-মানসিকতা পশ্চাদমুখী হয়ে যাচ্ছিল, তা এমনই প্রশস্ত সুদূর প্রসারী

হয়ে গেল, ফলে অনেক দূর পর্যন্ত ভাবতে শুরু করলাম। আমাদের নিজের প্রয়োজনাদী পূরণ করাই ছিল বিরাট কঠিন আর আজ তার অনুগ্রহে অন্যদের প্রয়োজনাদি পর্যন্ত পূরণ হচ্ছে। পূর্বে এক মাসও স্বস্তিতে কাটত না। এখন বছরের পর বছর দস্তরখান মেহমান শূন্য হয় না। তার সাহায্যে সব নেয়ামতই পূর্ণ হয়ে গেছে। আছে সব রকমের আরাম-আয়েশ, সুখ-সমৃদ্ধি; না কোনও চিন্তা আর না কোনও আশঙ্কা রইল। আরেকটু সামনে গিয়ে লিখেন–

"এ ঘর আমার জন্য জান্নাত আর এ খেদমত আমার জন্য রহমত ছিল। যেন আমি রহমতের ছায়ায় পরিবেষ্টিত হয়ে গেলাম। না রইল কোনও ভাবনা-চিন্তা, না কোনও কষ্ট-ক্লেশ। প্রতিমুহূর্ত কেটে যাচ্ছে শোকরগোযারী আর কৃতজ্ঞতায়।

کس زبان سے کرو میں شکر ادا
تیرے انعام و لطف بے حد کا
تونے مجہ کو کیا بنی آدم
اشرف الخلق اکرم العالم

"কোন্ ভাষায় ওগো আমি করব শোকর
নাই সীমা তব দান-অনুগ্রহের।
তুমিই তো মোরে বানালে মানুষ
সৃষ্টির সেরা সম্মানী এই লীন জগতের।"

ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার জীবন, আমলের নিয়মানুবর্তিতা

হিজরী ১৩২৬ মোতাবেক ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের কথা। সে বছর ছিল আমাদের পরিবার বরং আমাদের বংশের জন্য আমুল হুয্ন তথা দুঃখের বছর। সে বছর দু'মাসের ব্যবধানে আমাদের শ্রদ্ধেয় দাদাজান ও নানাজান দু'জনই ইন্তিকাল করেন। এভাবে আমার আব্বাজান এবং আমার আম্মাজান উভয়ের একই প্রকৃতির শোক যন্ত্রণার শিকার হতে হয়। আর প্রকৃত অর্থেই তারা একে অপরের দুঃখের অংশীদার ছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ্ আল্লাহর শোকর! দুজনই এই সম্বন্ধের সাফল্য এবং এই ঘরের উন্নতি-সমৃদ্ধি ও বরকত দেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

এরপর থেকে আম্মাজানের বেশিরভাগ সময় লক্ষ্ণৌতে থাকতে হত। গৃহস্থলীর যাবতীয় কাজকর্মের দায়িত্বভার তার উপরই ন্যস্ত ছিল। মেহমানের সমাগম ছিল প্রচুর। বংশের কয়েকটি শিশু লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে

তার কাছে থাকত। ভাইজান লেখাপড়া করতেন। বিভিন্ন মেহমানের সমাগম, বিশেষত আত্মীয়-স্বজনের খাতির-যত্ন, তাদের মর্যাদা ও মন-মর্জি লক্ষ্য রাখা, সকলের অধিকারগুলো রক্ষা করা বিরাট স্পর্শকাতর ও কঠিক কাজ ছিল। আম্মাজানের জীবন সে সময় এমন ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্মনিবেদনের প্রতিচ্ছবি ছিল, যা ভারতীয় নারীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং ধর্মানুরাগী ও সুদীক্ষা প্রাপ্ত মুসলিম রমণীদের নিদর্শন। তিনি আব্বাজানের অনুমতি ব্যতিত তার জিনিসপত্রে অনধিকার হস্তক্ষেপ করতেন না। এ কাজ প্রায় নাজায়েয মনে করতেন। অথচ আব্বাজান তাকে ঘরের মালিক বানিয়ে দিয়েছিলেন। ঘরে যেসব মৌসুমী ফলমূল এবং বাইর থেকে যত হাদিয়া উপহার আসত, যতক্ষণ পর্যন্ত আব্বাজানের সুস্পষ্ট অনুমতি না-হত, ততক্ষণ তিনি তা নিজের ভাই-ভাতিজা, বোন-ভাগ্নি তো দূরের কথা, নিজের সন্তানকে দেওয়া পর্যন্ত পাপ মনে করতেন।

আব্বাজানের সম্পর্ক খুব বেশি লোকজনের সাথে ছিল না বটে। তবে খুবই পরীক্ষিত, যাচাই-বাছাই করা লোকদের সাথে ছিল। তন্মধ্যেও সিংহভাগ লোক ছিলেন এমনই, যারা তার শাইখ হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী রহ. সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তাদের মাঝে বহুবিধ গুণাবলী ও স্বাতন্ত্রতার কারণে নবাব সাইয়িদ সিদ্দীক হাসান খান বাহাদুর ভূপাল প্রধান-এর বড় পুত্র মরহুম নবাব সাইয়িদ নুরুল হাসান খান এর সাথে ছিল খুবই গভীর ও অকৃত্রিম সম্পর্ক। আব্বাজানের সাথে তার এত গভীর সম্পর্ক ছিল যে, তাকে ছাড়া মোটেও স্বস্তি আসত না। এই বিশেষ সম্পর্কের কারণে আমাদের আম্মাজান এবং আমাদের ঘরের সকলকে তার ঘরে যেতে হত বারবার। অনুষ্ঠান কি, অনুষ্ঠান ছাড়াও কোনও মাস মুশকিলেই এমন যেত, যে মাসে কোনো-না-কোনও অজুহাতে তার বেগম সাহেবা আমাদেরকে না-ডেকে পাঠাতেন আর সারাদিন সেখানেই না-থাকতে হত। কিন্তু এই খোলামেলা অবস্থা সত্ত্বেও আম্মাজান তার দৃষ্টিভঙ্গি ও অভ্যাসরীতি তেমনই অটুট রেখেছিলেন, যেরূপ তার বংশে চলে আসছিল। তার সততা, অনাড়ম্বরতা, নির্জনতা, অল্পেতুষ্টি এবং দুনিয়াবিমুখতায় চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম ঘটেনি।

নবাব সাহেব ছাড়াও আব্বাজানের আরও কতিপয় অকৃত্রিম বন্ধু ছিল। তাদের ওখানেও যেতে হত প্রায়। তারা ছিলেন ধর্মপ্রিয়, আল্লাহভীরু এবং নেহাৎ মুখলিছ-একনিষ্ঠ বন্ধু-স্বজন। তাদের সকলেরই সম্পর্ক ছিল মাওলানা

ফযলুর রহমান সাহেব রহ. কিংবা মাওলানা মুহাম্মদ নাঈম ফিরিঙ্গি মহল্লীর সঙ্গে। যিনি ছিলেন মরহুম আব্বাজানের অতিপ্রিয় উস্তাদ অথবা তার সঙ্গে বিশেষ কোনও শিক্ষাগত ও দ্বীনী (ধর্মীয়) সম্পর্ক। একজন মুন্সী মুহাম্মদ খলীল সাহেব, দ্বিতীয় মুন্সী রহমতুল্লাহ সাহেব, তৃতীয় হাজী শাহ মুহাম্মদ খান সাহেব এবং চতুর্থ শায়খ মুহাম্মদ আরব সাহেব– যারা ছিলেন আব্বাজানের উস্তাদ এবং উস্তাদপুত্র– বেশিরভাগ আব্বাজানের বিভিন্ন উৎসব ও নিমন্ত্রণে তাদের কয়েকটি ঘরে যাতায়াত ছিল।

এই সুদীর্ঘ সময়ে যেখানে জীবন ও বংশ-পরিবারে অনেক উত্থান-পতন এসেছে, তার মধ্যে একাধিক সন্তানও হয়েছে। সুখ-দুঃখও এসেছে, আবার এসেছে আনন্দ-বেদনা ও হাসি-কান্না। তবু তার নিয়মিত দু'আর আমলগুলো এবং কুরআন তিলওয়াতের ব্যস্ততাও যথারীতি চালু ছিল। রমাযানুল মুবারাকে কুরআনে কারীমের দাওর এবং মাঝে মধ্যে তারাবীহ নামাযেও কুরআনে কারীমে খতমের ধারাবাহিকতাও বহাল ছিল। বড় ভাই সাহেবের তখনও আম্মাজানের সাথে মহব্বত ছিল, যখন তাঁর আম্মাজান বেঁচে ছিলেন আর পরবর্তীতে তো তিনি আম্মাজানের এবং তার নিজের মায়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য বুঝতেন না। আর আম্মাজানও তাকে সব সময় নিজের সন্তানের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আব্বাজানের দুই বোন এবং ভাইজানের বিয়ে বড় আগ্রহ-উদ্দীপনা, রুচিশীলতা ও সুব্যবস্থাপনার সঙ্গে করিয়েছেন।

জীবনসঙ্গীর বিচ্ছেদ বিরহ এবং আত্মনিবেদনের জীবন

মোটকথা, সে দিনগুলো সর্বপ্রকার সুখ-সমৃদ্ধি, আনন্দ-হাসি আর কল্যাণ ও বরকতের সাথে কেটে যাচ্ছিল। আকস্মিক ৫ জুমাঃ উখরা ১৩৪১ হিঃ/ ২ ফেব্রুয়ারী ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে আব্বাজানের ইন্তিকালের ঘটনা ঘটে। পূর্ব থেকে মানসিকতা এতটুকুও প্রস্তুত ছিল না। আমার চাচা মাওলানা সাইয়িদ আযীযুর রহমান সাহেবের সামান্য আঘাত লেগেছিল। আব্বাজান তার শুশ্রূষার জন্য আম্মাজানকে তার ওখানে পাঠিয়ে দিলেন। মাগরিবের পর পর্যন্ত কাজ করলেন। সাক্ষাত করলেন মানুষদের সাথে। নদওয়ার কাগজপত্রে দস্তখত করলেন। তারপর হঠাৎ করে মৃত্যুরোগ এসে আক্রমণ করে এবং ঘণ্টা দু'য়ের মধ্যে আপন সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন।

আমার ভালমত স্মরণ আছে, আমার বয়স তখন মাত্র নয় বছর। আমিই গেলাম আম্মাজানকে আনতে। তিনি ফিরে এসে যখন ঘটনা জানলেন, তখন তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। যা হওয়ার ছিল, তা তো হয়েই গিয়েছে। স্বয়ং তার ভাষায় এই শোক যন্ত্রণা এবং এর উপর ধৈর্য ও সন্তুষ্টির বিবরণ শুনুন!

"যখন খেদমতের সময় ফুরিয়ে এল, তখন ঐ আসল মালিক আমার পক্ষে ভাল মনে করে নিয়তির অজুহাত দাঁড় করালেন। নিয়তি সেই অমোঘ নির্দেশ পেয়ে ফায়সালা করে দিল তৎক্ষণাৎ। আমিও আমার আসল মালিকের ইচ্ছে-সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। কিন্তু এই বিচ্ছেদ যন্ত্রণা এমন ছিল না যে, সহ্য করে নিব। এটাও তার রহমত ও হেকমত ছিল, যা আমাকে তার খুশিতে সন্তুষ্ট রেখেছে। অন্যথায় যে অবস্থায়ই হত, তা-ও কম ছিল। এমন একজন প্রিয়তম ও একান্ত বন্ধুর আকস্মিক দৃষ্টির অন্তরালে চলে যাওয়া কিয়ামত অপেক্ষা কম ছিল না। আমি বলতে পারব না যে, এ মন তারপর কিভাবে মন হিসেবে রইল! সুতরাং এ হুকুম আমার জন্য ধ্বংস ও বিপদ ছিল না বরং সরাসরি রহমত ও সাহায্যেও মাধ্যম ছিল বলতেই হয়। ফলে ধ্বংস ও নিঃশেষের পরিবর্তে তিনি আমাকে নিজের রহমতের ছায়ায় নিয়ে নেন। আর প্রতিটি পদে পদে সাহায্য সহায়তা দিতে থাকেন একান্ত বন্ধু, সহমর্মী ও সাহায্যকারী হয়ে। সুবহানাল্লাহ! কি অসীম তার রহমত! কী অপার তার মাহাত্ম্য!

সে সময় লক্ষ্ণৌর ঘরগুলোর মধ্যে পুরুষ বলতে আমিই ছিলাম। তা-ও নয়/দশ বছরের বালক। ভাইজান মেডিকেল কলেজ লক্ষ্ণৌর পক্ষ থেকে (যেখানে তিনি লেখাপড়া করতেন) ছাত্রদের একটি কাফেলাসহ মাদ্রাজ গিয়েছিলেন। সেখানে ডাক্তারীর বিশেষ কোনও শাখা ছিল, যা তখনও লক্ষ্ণৌতে চালু হয় নি। আর বড়দের মধ্যে ছিলেন আব্বাজানের আপন ফুফাত ভাই মাওলানা সাইদি আযীযুর রহমান সাহেব নদভীও। তবে তিনি অসুস্থ ছিলেন।

পরের দিন ১৬ জুমাঃ উখরা ১৩৪১ হিজরী (৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৩ খ্রিঃ) আমরা ছোট্ট একটি অসহায় কাফেলাসহ স্বদেশ রায়বেরলী যাত্রা করলাম। সেখানেই বংশীয় বুযুর্গদের পাশে আব্বাজানের দাফন হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। বাহ্যত সেদিন আমরা চিরদিনের জন্য লাখনু ছেড়ে যাচ্ছিলাম। মাথা থেকে উঠে গিয়েছিল পিতৃছায়া। ভাইজান ছিলেন পরদেশে বিভূঁই।

আব্বাজান মিরাছ হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন মাত্র এক রুপি। ঋণ হিসেবে কিছু ফিস আটাওয়ার এক রাজার দায়িত্বে ছিল। ঘরে প্রথম থেকেই না কোনও সম্পদ ছিল আর না কোনও বন্দোবস্ত। দিনের আয় দিনেই খরচ। সুতরাং শঙ্কা করার অভ্যাস আব্বাজানের ছিল না। ভাইজানের লেখাপড়াও ছিল অসম্পূর্ণ। খুব সম্ভব তখনও দু'বছর বাকী ছিল। আমার এখন স্মরণ নেই, প্রথম সময়ের দিনগুলো কিভাবে কেটেছে। অবশ্য মামারা নেহাৎ স্নেহপরায়ণ এবং আম্মাজানের বিরাট নিবেদিতপ্রাণ ভাই ছিলেন। কিন্তু আম্মাজান নিজের সহজাত সাহসিকতা ও দৃঢ়চিত্ততার মাধ্যমে আমাদেরকে কখনও বুঝতেই দেন নি যে, আমরা আজ এতিম হয়ে গিয়েছি। আমাদের পূর্বের অবস্থা এখন আর নেই। সম্ভবত সপ্তাহ দশ পরে ভাইজান (যিনি এই দূর্ঘটনার সংবাদ এক আশ্চর্যজনক পন্থায় মোম্বাইতে শুনেছিলেন) হঠাৎ করে রায়বেরলী এসে পৌঁছলেন। সেই দৃশ্য এখনও দৃষ্টিগোচর হয়। আব্বাজানের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ব্যাকুলতার সাথে তার অঝোর কান্নার চিত্র যেন স্মৃতিপটে গতকালের কথা। তারপর ঘরে এসে মা-বোনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। আল্লাহ পাকের শত সহস্র রহমত হোক তার আত্মার ওপর। এরপর তিনি এক মুহূর্তের জন্যও বুঝতে দেন নি যে, আমরা ভাইবোন পিতৃছায়া থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি। সেদিন থেকে তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি পিতৃসুলভ স্নেহ-মমতা, অনুগত সন্তানের সেবা-শুশ্রূষা আর বিচক্ষণ দায়িত্বশীল ভাইয়ের মত মহব্বত করেছেন। আম্মাজান এবং আমাদের সকল ভাই-বোনের সঙ্গে এখন তার বদান্যতা, স্নেহ-মমতা ও মহব্বত পূর্বের চেয়ে আরও বহুগুণে বেড়ে গেল। সে এক বিরাট কাহিনী। যা শোনানোর অবকাশ আম্মাজানের জীবন বৃত্তান্তে নেই। ভাইজানের জীবনালেখ্য এবং তার দিনকর্ম আল্লাহ যদি কখনও লিখার তাওফীক দেন, তবে সেকথাও শোনানো যাবে (ইনশাআল্লাহ)।[১]

জীবনের ব্রত

রায়বেরলীতে ইদ্দতকালীন সময়ে এবং তার পরেও আম্মাজানের দু'টি ব্যস্ততাই ছিল। **এক.** ধর্মীয় কিতাবাদী পড়িয়ে শ্রবণ করা, যার বেশির ভাগ পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। **দুই.** তার সারাজীবনের ব্রত দু'আ ও ইবাদতের নিয়মানুবর্তিতা।

---

[১] আব্বাজানের জীবনকর্মের পরিশিষ্টরূপে ভাইজান ডাঃ আব্দুল আলী সাহেবের জীবনকর্ম "হায়াতে আব্দুল হাই" নামে সম্পন্ন হয়। ছাপা হয় ১৯৭০ খ্রিঃ নদওয়াতুল মুসান্নিফীন দিল্লি থেকে।

রচনাবলী

আম্মাজান বিভিন্ন মুনাজাত ও কবিতা লিখে তার দুঃখ ভুলার ব্যর্থ চেষ্টা করতেন। সান্তনা দিতেন নিজের মনকে। বংশের শিশুকন্যাদেরকে নিজের কাছে রেখে, তাদের শিক্ষা-দীক্ষায় ব্যস্ত থেকে নিজের মন ভুলিয়ে রাখতেন। সেসব মুনাজাত ও কবিতাগুলোর প্রথম সংকলন "বাবে রহমত" নামে ১৯২৫ খ্রিঃ ভাইজানের ঐকান্তিক চেষ্টা ও তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে তিনি আমার নামে একটি বিরাট প্রভাবময় পরিচিতিমূলক ভূমিকাও লিখেছেন। এ কিতাবখানা অতি দ্রুত ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক মুসলিম নারী এবং দু'আ ও মুনাজাতপ্রেমী বহু রমণীই তা পড়ে মুনাজাতের অব্যক্ত স্বাদ আর দু'আর মজা উপভোগ করেছেন। এ সংকলটি অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে।

নিজ বংশ এবং অন্যান্য মুসলিম শিশু কন্যাদের জন্য তিনি আরেকটি কিতাবও রচনা করেছেন। যাতে ধর্মীয় ও চারিত্রিক হেদায়াত, সুখী পরিবারের রূপরেখা, মনোহারী দাম্পত্য জীবনের নিয়ম-নীতি, শিষ্টাচার, দায়িত্ব-কর্তব্য, প্রাপ্য অধিকার এবং গৃহস্থলীর কাজকর্মের শিক্ষা দিয়েছেন। এ কিতাবখানাও কয়েক বছর পর "হুসনে মু'আশারাত" (উত্তম দাম্পত্যজীবন) নামে ছাপা হয়। গ্রহণযোগ্যও হয় দারুণভাবে। আম্মাজান খাবার তৈরী, পরিবেশন ও বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবনেও ছিলেন সৃজনশীল মানসিকতার অধিকারী। এ বিষয়েও তিনি একটি পুস্তক রচনা করেছেন "যায়িকাহ" (বা রকমারি স্বাদ) নামে। যা ১৯৩০ খ্রিঃ "নামী প্রেস" লক্ষ্ণৌতে ছাপা হয় এবং দারুণ সমাদৃত হয়।

আমার সাথে আম্মাজানের আচরণ এবং শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা

যখন আমার (হযরত মাওলানার) নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষাদীক্ষা শুরু হল, তখন আম্মাজানের এক নতুন ব্যস্ততা বেড়ে গেল। ঘরে কোন বড় পুরুষ লোক না-থাকার কারণে আম্মাজানই ছিলেন আমার তত্ত্বাবধায়ক, চারিত্রিক ও ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্বশীল। কুরআনে কারীমের বড় বড় সূরাগুলো তিনি আমাকে সে সময়ই মুখস্ত করিয়েছেন। তার স্নেহ-মমতা বংশে প্রবাদতূল্য ছিল। আর আব্বাজানের ইন্তিকালের কারণে তিনি আমার মনোরঞ্জন এবং এক ধরনের আদর-সোহাগ অলৌকিকভাবে অন্যান্য মায়েদের তুলনায় বেশি করতেন। তদুপরি দুটি বিষয়ে তিনি আমার উপর বিরাট কঠোর ছিলেন। প্রথমত নামাযের ব্যাপারে অলসতা তিনি একদম সহ্য করতেন না। আমি ইশার নামায না-পড়ে শুয়ে গেলে ঘুম যতই গভীর হত, তবু তিনি উঠিয়ে

নামায পড়াতেন আমাকে। কখনও নামায পড়া ছাড়া ঘুমাতে দিতেন না। তদ্রুপ ফজরের সময় জাগিয়ে দিতেন। পাঠাতেন মসজিদে। তারপর বসিয়ে দিতেন কুরআন তেলাওয়াতে। দ্বিতীয়ত যে ব্যাপারে তিনি মোটেও ছাড় দিতেন না। এমনকি আমার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অসাধারণ স্নেহ-মমতা আর অলৌকিক আদর-সোহাগ এতটুকু বিঘ্ন ঘটাত না, সেটি হল, "আমি যদি খাদেম-কর্মচারীদের কোনো সন্তান কিংবা গরীব কাজের ছেলেদের সাথে কোনো বাড়াবাড়ি, দুর্ব্যবহার, অন্যায় আচরণ বা হেয়তা ও দাম্ভিকতাপূর্ণ আচরণ করতাম, তা হলে তিনি না কেবল তার কাছে আমাকে মাফ চাওয়াতেন বরং হাত পর্যন্ত মিলিয়ে দিতেন। তাতে আমর যতই অপমান আর লজ্জাবোধ হত না কেন! কিন্তু তিনি এর অন্যথা মেনে নিতেন না। এতে আমার জীবনে বিরাট কল্যাণ সাধিত হয়েছে। জুলুম-অবিচার ও গর্ব অহংকারের প্রতি ভয়-ভীতি জন্ম নিয়েছে। কারও মনোকষ্ট দেওয়া এবং কাউকে লাঞ্ছিত-অপদস্ত করাকে কবীরা গুনাহ বুঝতে শিখেছি। একারণে সব সময়ই আমার পক্ষে নিজের ভুল স্বীকার করে নেওয়া সহজ মনে হয়েছে।

আমি যখন লক্ষ্ণৌতে থাকতাম, তিনি চিঠিপত্রের মাধ্যমে আমাকে বিভিন্ন উপদেশ ও হেদায়াত দিতেন। তখন তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-স্বাদ একীভূত হয়ে আমার মধ্যে এসে গিয়েছিল। আমাকে আপন পূর্বসূরী বুযুর্গদের সঠিক উত্তরসূরী, নিজের খ্যাতিমান পিতার খাঁটি পথিকৃৎ, নিজ বংশের বৈশিষ্ট্যাবলির ধারক-বাহক– না কেবল বংশের বরং ইসলামের নাম সমুজ্জ্বলকারী, দ্বীনের একনিষ্ঠ মুসাল্লিগ ও দাঈরূপে দেখার অভিপ্রায় তার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা এবং জীবনের প্রদীপ ছিল। যার ধ্যান-সাধানাতেই তার মধ্যে শক্তি-সাহস আর প্রাণ অক্ষুণ্ন ছিল। এখন তার প্রতি মুহূর্ত এরই চিন্তা, প্রতিনিয়ত এরই ধ্যান-আরাধনা, প্রতি মুহূর্ত এরই দু'আ-মুনাযাত, প্রতি মুহূর্ত এরই আলোচনা।

আম্মাজানের শিক্ষাদীক্ষার এই ধরন-প্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে একটি অভিজ্ঞতা এবং পরামর্শ হিসেবে আরও বলতে ইচ্ছ হয় যে, শিশুদের ধর্মীয় ও চারিত্রিক উন্নতি এবং তাদের দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্বীন-ধর্মের খেদমত নেওয়া কিংবা গ্রহণযোগ্যতা দানের উপযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের বিরাট দখল রয়েছে। **প্রথমত.** তাকে (নিজ বয়স অনুপাতে) জুলম এবং কাউকে মনোকষ্ট দেওয়া থেকে পবিত্র থাকতে হবে। কোনও ব্যথিত মনের আহ্ ধ্বনী কিংবা মজলুমের বুকের উষ্ণশ্বাস যেন তার ভবিষ্যতের উপর প্রভাব না ফেলে।

দ্বিতীয়ত তাদের পানাহার দ্রব্য যেন অবশ্যই লুণ্ঠিত, হারাম ও সন্দেহপূর্ণ মাল থেকে পবিত্র থাকে। বাহ্যত আল্লাহ পাক এ অধমের পক্ষে উক্ত দুটি জিনিসের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমার দাদার পরিবার ধন-সম্পত্তি, বিলাসসামগ্রী এবং মিশ্রিত সন্দেহযুক্ত মাল ও ঋণ থেকে যুগ যুগ ধরে পবিত্র ছিল। আব্বাজানের আয় একান্ত ডাক্তারী পেশার দান ছিল। এভাবে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে না কেবল সংশয়-সন্দেহপূর্ণ মাল-সম্পদ বাঁচিয়েছেন বরং বিদআত-কুসংস্কার এবং প্রথা-প্রচলনের খাবার থেকেও রেখেছেন নিরাপদ।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। আমি একবার আমাদের গৃহপরিচারিকার সঙ্গে (যিনি মোটেও পড়ালেখা করেন নি) আমার ফুফুর নিকট খালেছ হাঁট (রায়রেবলীর একটি মহল্লা) যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে এক জায়গায় দুঃস্থ-গরীবদেরকে (চল্লিশা কিংবা সদকার খাবার খাওয়ানো হচ্ছিল) উক্ত বৃদ্ধা আয়া, যার সাথে আমি যাচ্ছিলাম– তিনি খাবার নিলেন এবং সেখানেই বসে খাবার খেতে শুরু করলেন। আমি ছিলাম অবুঝ বালক। খাবার দেখে আমারও জিভে পানি এসে গেল। আমিও চাইলাম অংশ নিতে। তিনি বললেন– না, বাবা না। এসব তোমার খাওয়ার জিনিস নয়। তিনি আমাকে খেতে দিলেন না। এটা সম্ভবত ঘরের সেই পরিবেশ ও সতর্কতার ফল ছিল, যা তিনি বরাবরই দেখে থাকবেন। সেকালে আমাদের বংশে একটা খুবই চমৎকার রীতি ছিল। যেখানে এরূপ কোনও দুঃখ-শোকের ঘটনা ঘটত, মন ভারাক্রান্ত হত কিংবা কোনও পেরেশানীর ব্যাপার হত, তখন সেখানে "ছমছামুল ইসলাম" صمصام الإسلام পড়ে শোনানো হত। এটা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ওয়াকেদী রহ. এর বিখ্যাত গ্রন্থ "ফুতূহুশ শাম" এর পঁচিশ হাজার শ্লোকে কাব্যানুবাদ। এ কাব্যানুবাদ আমাদের বংশেরই এক প্রবীন বুযুর্গ আমার আব্বাজানের আপন ফুফা মুনশী সাইয়িদ আব্দুর রায্‌যাক সাহেব কালামীর রচিত। তাতে লেখক আবেগ-উচ্ছাসে ভরা, ব্যথা-ভারাক্রান্ত হৃদয়স্পর্শী যুদ্ধের এমন প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেছেন, যাতে মন আবেগে উদ্বেলিত হতে থাকে। প্রাণস্পন্দন তীব্র হয়ে যায়। শাহাদত বরণের বর্ণনা এমনভাবে পেশ করেছেন, ফলে স্বয়ং আল্লাহর রাহে জীবন সঁপে দেওয়ার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সাহাবায়ে কিরাম রাযি. ও মুজাহিদীনে ইযামের কষ্ট-ত্যাগের সম্মুখে মানুষ ভুলে যায় তার সকল দুঃখ-ব্যথা। আমার মরহুমা খালা বিবি সালেহা –যিনি কুরআনে কারীমের হাফেযও ছিলেন– এই কাব্যিক ফুতহূশ শাম অত্যন্ত প্রভাবময় ও মর্মস্পর্শী ভঙ্গিতে পড়তেন। আর পড়তে পড়তে কিতাবিটি তাঁর খুব চালু হয়ে গিয়েছিল। সাধারণত আসরের পরে এই বৈঠক বসত। শিশুরাও তাদের মায়েদের পাশে

খেলায় খেলায় কিংবা কোনও সংবাদ নিয়ে এসে হাজির হত। আর অনিচ্ছায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনে যেত। কখনও ইচ্ছে করেই বসে পড়ত। আবার কখনও মায়েরাই নিজের পাশে বসিয়ে শোনার সুযোগ দিতেন। এরপর যখন তাতে মজা লেগে যেত, অমনি শিশুরা খেলা ফেলে ঐ মসজিলে শরীক হত।

দীক্ষামূলক চিঠিপত্র

এক সময় আমার মন-মানসিকতা দ্বীনী শিক্ষা থেকে কিছুটা ওঠে যেতে শুরু করেছিল। আগ্রহ জেগেছিল ইংরেজী শিক্ষা এবং সরকারী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের। ভাইজান কোনও পত্রে কিংবা রায়বেরলীর কোনও সফরে আম্মাজানের কাছে আমার এই নতুন আগ্রহের অভিযোগ করলেন। এরই প্রেক্ষিতে তিনি আমার নামে যে সুদীর্ঘ পত্র লিখেছেন, তাতে তার চিন্তাধারা, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, তার ঈমানী শক্তি, দ্বীনের প্রতি প্রেম-অনুরাগ ও আসক্তির অনুমান করা যায়। উক্ত পত্রের একটি অংশ হুবহু উল্লেখ করা হচ্ছে। অবশ্য তাতে কোনও সন-তারিখ লিখা নেই।। খুব সম্ভব পত্রখানা ১৯২৯ কি ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের লেখা। আম্মাজান লিখেন–

"আমার স্নেহের আলী!

(আল্লাহ তোমাকে নিরাপদ ও শান্তিতে রাখুন)

অদ্যাবধি তোমার কোনও পত্র পেলাম না। অপেক্ষায় থাকি প্রতিদিন। অপারগ হয়ে অবশেষে আমিই পত্র লিখছি। শীঘ্রই তোমার ভালমন্দ জানাবে।

আব্দুল আলী আসার কারণে স্বস্তি এসেছে অবশ্যই। কিন্তু তোমার পত্র এলে তো আরও প্রশান্তি লাগত। আব্দুল আলীর কাছে আমি তোমার দু'বার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা বলেছি। সে বলেছে, আলীর নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি মোটেও যত্ন নেই। যে সময়টুকু বিশ্রামের, তা-ও সে পড়ালেখায় কাটায়। আমি বললাম, তুমি বারণ কর না? সে বলল, আমি অনেক বলেছি এবং বলতেই থাকি। কিন্তু সে খেয়াল করে না। এতে ভীষণ দুশ্চিন্তা হয়েছে। আমি বেশ চিন্তিত তোমার অযত্ন, ভ্রুক্ষেপহীনতা ও অনভিজ্ঞতার কারণে আর তোমার অযথা আশঙ্কাপূর্ণ মেহনতের দরুন। আলী! আমার আশা ছিল, তুমি ইংরেজীর প্রতি আকৃষ্ট হবে না। কিন্তু আশার বিপরীত তুমি চলতে শুরু করেছ আর অধিক পরিশ্রমকে বেছে নিয়েছ। বেশ তো! তুমি যা কিছু করেছ, এটাও তার [আল্লাহর] হেকমত। তবে ইস্তিখারা করে নেওয়া কর্তব্য।

আমার তো ইংরেজীর প্রতি মোটেও আসক্তি নেই বরং আছে ঘৃণা-বিতৃষ্ণা। কিন্তু তোমার খুশি মঞ্জুর। আলী! পৃথিবীর অবস্থা খুবই ভয়াবহ।

আজকের পৃথিবীতে আরবী শিক্ষিতদের পর্যন্ত আকীদা-বিশ্বাস ঠিক নেই। সুতরাং ইংরেজী শিক্ষিতদের থেকে আর কি আশা করা যায়? আব্দুল আলী আর তালহা ছাড়া তৃতীয় আর কোনও উদাহরণ খুঁজে পাবে না। আলী! মানুষ যদি মনে করে, ইংরেজী শিক্ষিতরা বিভিন্ন পদমর্যাদা লাভ করছে, কেউ ডেপুটি হচ্ছে আর কেউ জজ। অন্তত উকীল-ব্যারিস্টার তো অবশ্যই। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ এর বিপরীত। আমি বরং ইংরেজ শিক্ষিতদেরকে জাহেল-মূর্খ আর তার শিক্ষাকে নিষ্ফল এবং একদম বেকার মনে করি। বিশেষত এমতাবস্থায় কি হবে জানি না। আর কি শিক্ষার প্রয়োজন। অবশ্য এসময় ইলমে দ্বীনের প্রয়োজন ছিল।

এসব পদমর্যাদা তো যে কেউ অর্জন করতে পারে। এটা সাধারণ বিষয়। এমন কে যে বঞ্চিত! সে জিনিস হাসিল করা উচিত, যা এ মুহূর্তে সবচেয়ে মূল্যবান; কেউ অর্জন করতে পারে না। মন অধির। কিন্তু সে গুণাবলী দৃষ্টিগোচর হয় না। আক্ষেপ! আমরা এমন সময়ে জন্ম নিয়েছি। আলী! কারও কথায় ফাঁদে পড়বে না। তুমি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাও এবং আমার অধিকার রক্ষা করতে চাও, তবে তাদের প্রতি লক্ষ্য কর, যারা ইলমে দ্বীন অর্জনে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন, তাদের মর্যাদা কি ছিল? শাহ ওয়ালী সাহেব রহ., শাহ আব্দুল আযীয রহ., শাহ আব্দুল কাদীর রহ., মৌলভী ইবরাহীম সাহেব রহ.,[১] আর তোমাদের বুযুর্গদের মধ্যে খাজা আহমদ সাহেব রহ.[২] ও মৌলভী মুহাম্মদ আমীন সাহেব রহ.[৩] –যাদের জন্ম, জীবন ও মৃত্যু ছিল ঈর্ষণীয়, তারা কেমন প্রভাব-প্রতিপত্তির সাথে জীবন কাটিয়েছেন আর কত কত সম্মান-মর্যাদার সাথে বিদায় যাত্রা করেছেন।

---

[১] মাওলানা আবু মুহাম্মদ ইবরাহীম ছিলেন প্রসিদ্ধ আহলে হাদীস আলেম। আমাদের নানা, শাহ যিয়াউন্নবী সাহেব রহ. এর মুরীদ এবং বিরাট আল্লাহওয়ালা হক্কানী আলেম। তার ওয়ায-নসীহতগুলো খুবই প্রভাবময় ও সময়োপযোগী ছিল। তার একটি ওয়াযে আমাদের বংশের অনেক যুবকদের অভাবনীয় সংশোধন হয়েছে। তাদের কায়াই পাল্টে গেছে। ৬ যিলহজ্জ ১৩১৯ হিজরীতে মক্কা শরীফে তার ইন্তিকাল হয় আর দাফন করা হয় জান্নাতুল মু'আল্লায়।

[২] মাওলানা সাইয়িদ খাজা আহমদ নাসীরাবাদী ছিলেন একটি মধ্যস্থতায় হযরতদ সাইয়িদ আহমদ শহীদ রহ. খলীফা আর হযরত শাহ যিয়াউন্নবী রহ. এবং মাওলানা সাইয়িদ ফখরুদ্দীন রহ. এর শাইখ ও মুর্শিদ। তাওহীদ ও সুন্নাতের প্রসার এবং ইসলাহ ও তরবিয়তের কাজে তার পাল্লা অনেক ভারী ছিল। ১২৮৯ হিজরীতে তার ইন্তিকাল হয়।

[৩] মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীন নাসিরাবাদী। তাঁর মাধ্যমে রায়বেরলী, সুলতানপুর, পর্তাবগড় জেলা ও তার আশপাশের এলাকায় অনেক সংস্কারমূলক কাজ এবং শিরক-বিদআতের মূলোৎপাটন হয়েছে। তিনি ১৩৪৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন।

এ মর্যাদা কার লাভ হয়! ইংরেজী শিক্ষিত লোক তো তোমাদের বংশে অনেক আছে এবং আরও হবে। কিন্তু এ মর্যাদার, এ শিক্ষায় শিক্ষিত কেউ নেই। এখন তার প্রয়োজন অনেক। তাদের ইংরেজীর প্রতি কোনও আসক্তি ছিল না। তাঁরা ইংরেজীতে অজ্ঞ ছিলেন। তবু কেন এত মর্যাদা পেলেন তারা!

আলী! আমার যদি শত সন্তান হত, তবে আমি সবাইকে এ শিক্ষাই দিতাম। আজ কেবল তুমিই আছ। আল্লাহ তা'আলা আমার নেক নিয়তের সুফল দিন। যেন শত জনের গুণ-যোগ্যতা একা তোমার মধ্যে পাই। উভয় জগতেই যেন আমাকে ভাগ্যবান, সুখ্যাতি ও সুযোগ্য সন্তানদের মা বলা হয়। আমীন। ছুম্মা আমীন।

আমি আল্লাহর কাছে সব সময় প্রার্থনা করি- তিনি যেন তোমার মধ্যে সাহস এবং আগ্রহ-চেতনা দান করেন। বহুমুখী যোগ্যতা-প্রতিভা আর সকল দায়িত্ব পালনের তাওফীক দান করেন। আমীন।

এর চেয়ে বড় কোন বাসনা আমার নেই। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সেসব মর্যাদায় পৌঁছে দিন। অটল-অবিচল রাখুন। আমীন। আলী! আরেকটি উপদেশ দিচ্ছি। তবে তেমাকে মেনে চলতে হবে। নিজের প্রবীন বুযুর্গদের কিতাবাদী কাজে লাগাবে। আর সতর্কতা অবলম্বন করবে অবশ্যই। যে কিতাব থাকবে না, তা আব্দুল আলীর অনুমতি সাপেক্ষে খরীদ করে নিবে। বাকী সেসব কিতাবই যথেষ্ট। এতে তোমার সৌভাগ্য ফুটে উঠবে। কিতাবাদীও বিলীন হবে না। বুযুর্গদের আনন্দ হবে। আমার সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা এই সৌভাগ্য লাভের, যেন তুমি এই কিতাবাদীর খেদমত কর। যে টাকা-পয়সা খরচ করবে, তা এই প্রয়োজনে কিংবা খাবে।

কখনও ধার-কর্জ করবে না। থাকলে খরচ করবে; নতুবা ধৈর্য ধারণ করবে। ইলম পিয়াসীরা এভাবেই ইলম অর্জন করে। তোমাদের বুযুর্গগণ অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন। এ দিনগুলোর কষ্টকে গৌরবের কারণ মনে করবে। যে প্রয়োজন হবে, আমাকে লিখে জানাবে। আমি যেভাবে সম্ভব পূরণ করব। আল্লাহ মালিক। কিন্তু কর্জ করবে না; এ অভ্যাস ধ্বংস করে। যদি প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর, তবে কোনও সমস্যা নেই।

সাহাবায়ে কিরাম কর্জ নিয়েছেন। কিন্তু যথাসময়ে পরিশোধও করে দিয়েছেন। আমরা কী? আলী! আমার উপদেশ মেনে চলবে- এটাও তোমার সৌভাগ্য। হালুয়া এখনও তৈরী হয় নি। ইনশাআল্লাহ সুযোগ পেলেই তৈরী করে পাঠিয়ে দিব। নিশ্চিন্ত থাক।

খুব শীঘ্রই ভালমন্দ জানাবে। যদি বিলম্ব কর, তবে আমি মনে করব, আমার উপদেশ তোমার মনঃপুত হয় নি। ইনশাআল্লাহ রমাযান শরীফে তোমার থেকে ওয়াজ শুনব। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আমার প্রত্যাশা অপেক্ষাও বেশি বলার তাওফীক দিন। তোমার কথা যেন প্রতিক্রিয়াশীল এবং আল্লাহর খুশি ও সন্তুষ্টির যোগ্য হয়। আমীন اللهم اتنى افضل ما توتى عبادك الصالحين বাকী ভাল থেকো। আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি তৈরী থেকো। তুমি প্রতিশ্রুতিও দিয়েছ।

তোমার আম্মা

আম্মাজানের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তা ছিল, আমি যেন আমার বড় ভাই (আব্দুল আলী) এর কথামত চলি এবং তার হেদায়েতের উপর চোখ বন্ধ করে কাজ করি। তিনি তাকে স্বস্থানে সকল গুণের আধার এবং বংশের সম্মান-মর্যাদার পথিকৃৎ মনে করতেন। আমাদের বংশে হযরত শাহ আব্দুল কাদির রহ. এর কৃত তরজমা ও তাফসীর "মূযিহুল কুরআন" (যা তার প্রাচীন তরজমার টীকায় ছাপা আছে) এর সব সময় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একে এক হিসেবে নারীদের এবং লেখাপড়া জানা পুরুষদের পাঠ্যভূক্ত ধরা হয়েছে। মনে হয় আমি ভাইজানের তাগিদ সত্ত্বেও প্রতিদিন তা পড়া ও দেখার ব্যাপারে উদাসীনতা-শৈথিল্য প্রদর্শন আর বেশিরভাগ আরবী সাহিত্য ও উপরি কিতাবাদি অধ্যয়নে মগ্ন থাকতাম। ভাইজান সম্ভবত কোনও পত্রে আম্মাজানকে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন। এরই জবাবে আম্মাজান এক দীর্ঘ পত্র লিখেন। যার একটি উদ্ধৃতি নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে।

"যখন তুমি এখানে ছিলে, তখন আব্দু বিশেষভাবে লিখেছিল, শাহ আব্দুল কাদির সাহেবের তরজমা প্রতিদিন পড়বে এবং চিন্তা করবে। কিন্তু তুমি তার আদেশ পালন কর নি। আমি খুঁজে এনেছি এবং প্রতিদিন বলতে থেকেছি। তুমি গড়িমসি করতে থেকেছ। আর অন্যান্য কিতাবাদি নিয়ে ব্যস্ত থেকেছ। আমার ভীষণ অপছন্দ ছিল। কিন্তু এতখানি অমনোযোগীতা পরিষ্কার ছিল না। এ পত্র দেখে আমার যতখানি কষ্ট বোধ হয়েছে, আমি তা ভাষায় বলতে পারব না। এমনিতেই এ সময়ের অবস্থাদৃষ্টে আমারও স্বস্তি ছিল না। কিন্তু এখন সকল আশা-স্বপ্ন ভয়ঙ্কররূপে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। আলী! তোমার এ অযোগ্যতা আমাকে কঠিন পীড়া দিচ্ছে। তোমার কাছে আমার তো এ প্রত্যাশা ছিল না। আমার আশা ছিল, তুমি তোমার নিবেদিতপ্রাণ ভাইয়ের সম্পূর্ণ সমমনা ও অনুগত হবে। এ আশাতেই আমার স্বস্তি ছিল। কিন্তু

আক্ষেপ! বুঝতেই পারি নি, তুমি এমন ভাই, যে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় থাকে এবং নিজের সকল শক্তি-সাহস তত্ত্বাবধান আর শিক্ষাদীক্ষায় ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকে, তার চেষ্টাগুলোকে গৌণ মনে করে সকল অধিকার ভুলে যাবে। ভ্রুক্ষেপহীনতা ও সেচ্ছাচারিতামূলক আচরণ করবে। এ তো সেই সুহৃদ ভাই, যে এমন এক মুহূর্তে তোমার হাত ধরেছে, যখন আল্লাহ ছাড়া কাউকে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। আমি তোমার শিক্ষার জন্য ছটফট করছিলাম। স্বয়ং সে-ও পেরেশান ছিল। তবু সে নিজেই পরিশ্রমের পথ বেছে নিয়েছে। যা কিছু তোমার হাসিল হয়েছে, তারই দয়ায়। দেখ! এটা ইলম। আমল বলে তাকে। তুমি আদবে (আরবী সাহিত্যে) সহস্র এগিয়ে যাও। তবু আব্দুর মোকাবেলা করতে পারবে না আর না তুমি তার সেসব যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। কারণ, এখনকার চিন্তাধারাগুলো সে সুযোগই কবে দিবে? আব্দু এমন আলেম এবং যোগ্য ব্যক্তি– এসময় যদি তার মত আরেকজন দেখতে চাও, তবে খুঁজে পাবে না। তোমাদের বংশের সকল গুণ-বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন আব্দু।"

আরেকটু সামনে গিয়ে লেখাপড়ায় মনোযোগিতা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও প্রবীন জ্ঞানপিপাসুদের গুণ-বৈশিষ্ট্য অর্জনের উৎসাহ দিয়ে লিখেন,

"সব বিষয়ের আকর্ষণকে অনর্থক মনে কর। সৌখিন মানসিকতার লোকদের সাথে বন্ধুত্ব রেখ না। জ্ঞান-পিপাসুদের কেবলই পড়াশোনা করা উচিত। জুতা-কাপড় ছিঁড়ে-ফাঁটাই হোক, লজ্জার কিছু নেই বরং গর্ব করা উচিত। এ অবস্থা কল্যাণ ও সাফল্যেও কারণ হয়ে থাকে। তাদের দুঃখ-কষ্টে ইলমের কদর ও মূল্যায়ন হয়। বুদ্ধিমান ও সৌভাগ্যশীল সে ব্যক্তি, যে দুর্লভ-বিরল জিনিস অর্জন করে। তা কি? শরীঅত পরিপালন। এ সময়কার জ্ঞান অতি সাধারণ। যে কেউ তা অর্জন করতে পারে। দু'চারটা কিতাবাদি নিয়ে নিবে। ব্যাস, যোগ্য হয়ে গেল। শত সহস্র বিপদ আশঙ্কা থাকে সম্মুখে। ইচ্ছে হলে এ পত্রখানা মন দিয়ে পড়বে এবং প্রায়ই এর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে।"

অপর একটি পত্রে দ্বীনী ইলম এবং আরবী শিক্ষার প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করা, এতে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করা এবং প্রবীন উলামায়ে কিরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য তাগিদ দিয়ে লিখেন–

"এখন আরবীতে মেহনত করবে। তবে নিয়ম ছাড়া নয়। স্বাস্থ্যের প্রতি অবশ্যই যত্ন নিবে। সুস্থতা থাকলে সব কিছু হাসিল হতে পারে। তুমি যদি এতটুকু পরিশ্রম আরবীতে করতে, তবে আজ অনেক কিছুই হাসিল হয়ে যেত। যেসব কিতাব বাকী আছে, মনোযোগ দিয়ে সম্পন্ন করে নিবে। আর যথাসম্ভব

প্রবীন উলামায়ে কিরামের মতো যোগ্যতা-দক্ষতা অর্জন করবে। সেসব জ্ঞান অর্জন কর, যাতে কোনও কথা-কাজ শরীঅতের বিপরীত না হয়। সব মাসয়ালা-মাসায়েল গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন কর। আজ এই ইলমেরই প্রয়োজন। আজকের আলেম-উলামা জানে না কিছুই। শুধু সৃষ্টি করে নানা ফেৎনা। আমার আন্তরিক কামনা হল, তুমি যেন ইলমে সেই মর্যাদা হাসিল কর, যা বড় বড় উলামায়ে কিরাম অর্জন করেছেন। যাদের দেখতে চক্ষুযুগল আকুল হয়ে আছে, কান আসক্ত, মনপ্রাণ আবেগে তন্ময় হয়ে যায়। আলী! মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে সেসব গুণ-যোগ্যতা দান করেন। ফিরে আসে সেই সোনালী দিন। আমীন।"[১]

অন্য একটি চিঠিতে তিনি আরও লিখেন—

আমার স্নেহের আলী! (আল্লাহ তোমাকে সুস্থ-নিরাপদ রাখুন)

এই তো তোমার পত্র পেলাম। আমি অপেক্ষা করতে করতে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তখনই তোমার পত্র পেলাম। বিরাট খুশি হয়েছি। আলী! আল্লাহর রহমতে আমি দারুণভাবে আশাবাদী যে, তুমি কারও কোনও পদমর্যাদা ও সাফল্যে (বিন্দুও) প্রভাবিত হবে না। কেননা এটা সাধারণ ব্যাপার এবং নশ্বর-ক্ষণস্থায়ী। ঈর্ষণীয় হল সেই জিনিস, যা শত সহস্রের মধ্যে জন এক পায়। আর তা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে।

قسمت کیا ہر شخص کو قسام ازل نے
جو شخص کہ جس چیز کے قابل نظر آیا

(ভাগ করে দিয়েছে নিয়তি চিরন্তন সবাইকে, যে যার যোগ্য হয়েছে দৃষ্টিগোচর।)

তোমার এ নিয়ে গর্ব করা উচিত। নেহাৎ সাহস ও শক্তির সাথে কাজ করা উচিত। আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন এর প্রতি তোমার মনোযোগিতা সৃষ্টি করতে থাকেন। আর তুমি সব গুণ-যোগ্যতার উপর একে অগ্রাধিকার দিতে থাক। তোমার যদি বিচারপতির কিংবা অন্য কোনও পদমর্যাদা লাভ হত— যা অতি সাধারণ ব্যাপার, তবে আমার সেইসঙ্গে সহস্র বিপদ আশঙ্কা দৃষ্টিগোচর হত। তিনি আমাকে সকল ক্ষতি-বিপদ থেকে রক্ষার জন্য এমন উত্তম পন্থা পছন্দ করেছেন। তিনি স্বয়ং রক্ষাকর্তা, তত্ত্বাবধায়ক ও কার্যনির্বাহী। আমার উদ্বেগ-চিন্তার কোনও প্রয়োজন ছিল না। চিন্তার স্থলে

[১] সে সময় ইংরেজীর প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। ফলে স্বাস্থ্য এবং চোখে সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

আমার মন প্রতি মুহূর্ত এমন প্রীত হচ্ছে, যা কোনও উচ্চ মর্যাদাবান লোকেরও লাভ হয় না। তুমি যতই গর্ব কর, তা-ও কম।"

সালামান্তে
তোমার আম্মা

"আমার নয়ন মনি. কলিজার টুকরো আলী!

(আল্লাহ তোমাকে সুস্থ-নিরাপদ রাখুন!) তোমার দু'খানা পত্র পেলাম। বিস্তারিত শুনে মনে স্বস্তি এসেছে। মাওলানা আহমদ আলী সাহেবের পুত্রও তোমার সঙ্গে আছে শুনে বিরাট খুশি হয়েছি। দেখো, কতদিন থাকতে হয়। আল্লাহ পাক দ্রুত কামিয়াব করুন। আমীন।

বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে আমি দু'আ করি, আল্লাহ পাক যেন তোমাকে সেই ইলম ও জ্ঞান দান করেন, যা অর্জন করেছেন সাহাবায়ে কিরাম রাযি.। যার দ্বারা ঈমান শক্তিশালী হবে। পবিত্র হবে সব পাপ-পঙ্কিলতা, পরিত্রাণ পাওয়া যাবে বর্তমান সময়ের সকল ফিৎনা-ফ্যাসাদ থেকে; প্রশান্তি আসবে পুরোপুরি।

আমি বলতে পারব না, আমার যে আশা এবং যে কারণে আমার ইলমে দ্বীন হাসিলের স্বপ্ন-সাধ জেগেছে। আল্লাহ পাক আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন। সুখী ও সাফল্যমণ্ডিত করুন ইহ-পরকালে। আমীন। তুমি যদি এভাবে নিয়মিত পত্র লিখে জানাও, তবে আল্লাহর শোকরিয়া জ্ঞাপন করব। আজকাল আবুল খায়ের প্রতি জুমায় ওয়ায করে, ময়দানপুরেও হয়। আল্লাহর কৃপায় তোমাদের দ্বারা দ্বীন ইসলাম প্রসারিত হোক। মিটে যাক কুফর-বাতিল। আমীন। আল্লাহ পাক তোমাদেরকে অবিচল দৃঢ়পদ রাখুন। পাঁচ রূপি আব্দুকে দিয়ে দিয়েছি। ইনশাআল্লাহ হাতে এলে আবার পাঠাব। মামা (মাওলানা সাইয়িদ উবাইদুল্লাহ) সাহেব, মামাজী (মাওলানা সাইয়িদ আহমদ সাঈদ) কে সালাম লিখলে তখন ভাইজান (তথা আপন মুরব্বী মাওলানা সাইয়িদ খলীলুদ্দীন ইবনে মাওলানা রশীদুদ্দীন) কেও লিখবে। মাহমূদ, মুহাম্মদ ছানী (আল্লাহ তাদের সুস্থ-নিরাপদ রাখুন) পড়াশোনা করছে। দু'আ করি, আল্লাহ যেন তাদেরকে প্রশান্তির উপযুক্ত বানান।

সালামান্তে
তোমার আম্মা

নয়নমনি আত্মার ধন প্রাণের আলো আলী!

(আল্লাহ তাকে নিরাপদ রাখুন, দান করুন দীর্ঘায়ু)

আল্লাহ পাকের উপর ভরসা। তিনি তোমার রক্ষাকর্তা ও সাহায্যকারী। তুমি নিয়মিত পত্র লিখে যাবে। তা হলে আমার স্বস্তি থাকবে। সাবধান! শক্তি-

সাহসের চেয়ে অধিক পরিশ্রম করবে না। এ মৌসুমে অতিমাত্রায় পরিশ্রম মেধা-মনন সহ্য করতে পারে না। মন-মস্তিস্কের সুস্থতা জরুরী বিষয়। এর প্রতি বেশি যত্ন নিবে। যথাসম্ভব এক মাসের পরিশ্রম একদিনে করবে না। তুমি যদি এরূপ পরিশ্রম কর, তবে দুনিয়া-সংসার কিভাবে চালাবে? দুনিয়া ঠিক রাখাও একটি এবাদত। সহমর্মিতা-সমবেদনা আর ন্যায়ানুগতা সবই আল্লাহ-রাসূল সা. এর সন্তুষ্টির মাধ্যম। তা ছাড়া সকল আত্মীয়-স্বজন এর প্রতীক্ষায় থাকে। বিশেষত তোমার কাছে অনেকেরই যথেষ্ট প্রত্যাশা রয়েছে। আমি চাই তুমি পাশ্চাত্যবাসীদের থেকে জ্ঞান-প্রজ্ঞায় বড় হও; অভিশপ্তরা যেন ধর্মীয় শিক্ষা ও শাস্ত্রের প্রতি কোন প্রশ্ন-আপত্তি ছুড়ে মারার সুযোগ না-পায়। আল্লাহ তা'আলার কাছে সবসময় দু'আ করি, তোমার যেন এমন এমন যোগ্যতা অর্জিত হয়, যাতে সেসব গুণ-যোগ্যতা– যার উপার সব মানুষ গর্ব করে, সবই গৌণ হয়ে যায়। সকলেই অনুরাগী হয় ধর্মীয় শাস্ত্র-জ্ঞানে। আল্লাহ পাক আমার প্রত্যাশা পূর্ণ করুন। আমীন।

তুমি তাড়াতাড়ি পত্র লিখবে। নতুবা আমার ভীষণ কষ্ট হবে। আব্দু তোমার কর্মপদ্ধতিতে ভারী খুশী হয়েছে। সে আমাকে লিখেছিল। এটা ছিল প্রথম পত্র, যার থেকে এই পুণ্যময় বাক্য প্রকাশ পেয়েছে। আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল, আব্দুর ভাষায় শুনব। আল্লাহর শোকর! সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। এই আকাঙ্ক্ষা হল, প্রত্যেক ভাষায় তোমার সুনাম ও সফলতা আসুক। আমীন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সৎ ইচ্ছাগুলো পূর্ণ করুন। তোমাদের রাখুন অটল-অবিচল। পরিচালিত করুন তাদের পথে, যাদেরকে তিনি পুরস্কৃত করেছেন। কবুল করুন তোমাদের আমলগুলো।

সালামান্তে

তোমার আম্মা

আমার প্রিয় আলী!

(আল্লাহ তোমাকে সুস্থ-নিরাপদ রাখুন!) তোমার কার্ড পেয়েছি। তোমার পরীক্ষা ভাল হচ্ছে জেনে ভীষণ খুশি হয়েছি। এবার পরীক্ষায় ভয় ছিল। আল্লাহর কাছে সব সময় দু'আ করেছি। তার রহমতের অপেক্ষা কর। যখন তার রহমতে ফলাফল প্রকাশ হয়ে যাবে, তখন ইনশাআল্লাহ খুশিমনে আসবে আর যতদিন না ফলাফল জানা যাবে, প্রত্যেহ সকালে সুন্নাত ও ফরযের মধ্যে বিনয়-নম্রতা ও একাগ্রতার সাথে সূরা ফাতিহা একচল্লিশবার পড়বে। আর পূর্বে ওপরে এগারবার করে দরূদ শরীফ পড়বে। এটা বিরাট উপকারী। তারপর ফরয পড়ে সূরা ফাতিহা একবার, সূরা 'আলাম-নাশরহলাকা' তিনবার

আর ইন্না আনযালনা একবার পড়ে নিবে। পূর্বে ও পরে দরূদ পড়বে। সম্ভব হলে সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলাই পড়বে। ভরসা রাখবে আল্লাহর ওপর। আমি আল্লাহর সমীপে তোমার জন্য এই মুনাজাত করেছি। আল্লাহ যেন তা কবুল করেন। আমীন।

سدا سے ترے مجھ پر انعام ہیں
ھیں انعام بھی اور اکرام ہیں

جو مانگا دیا ، اور دیا بے طلب
پھری میں ترے در سے محروم کب

تہی جو کچھ مجھے فکر سب دور کی
میں لائی جو حاجت و منظور کی

ترے فضل کی کچھ نہیں انتہا
جو ایا ترے در پہ وہ خوش ہوا

تری شان رحمت سے ہے یہ بعید
پھرے در سے تیرے کوئی ناامید

کرم کم میرے حال پر بھی کریم
کہ ہے نام تیرا غفور و رحیم

مری سعی و کوشش نہ برباد کر
ترے در پہ آئی ہوں امداد کر

دعا جلد میری یہ ہو مستجاب
علی ہو ترے فضل سے کامیاب

وہ ہو کامیابی جو ہو باسند
ہوایسی سند جوکہ ہو مستند

نہ ہو فکر کوئی نہ رنج و تعب
تمنائی بر آئیں میری یہ سب

خطائوں پہ ان کے نہ کر تو نظر
یہ بندے ہیں تیرے توہی رحم کر

چہاں سدا دونوں پہولیں پہلیں
سدا یہ شریعت پہ قائم رہیں
یہ سب بہن بہائی رہیں شاد کام
جہاں میں ہو اقبال ان کا غلام
خزاں میں جو ہے آج فضل بہار
یہ سب فضل تیرا ہے پرور دگار
یہ فضل بہاری رہے تاحیات
ہو بہتر کی بہتر حیات اور ممات

(কাব্যানুবাদ)

রয়েছে সদা তোমার করুণা
মাওলা আমার পরে,
রয়েছে আরও দান-সম্মান
কত যুগ ধরে।
(২) দিয়েছ যত প্রার্থনা মোর
আরও কত নিজ হতে,
তোমার দুয়ারে গিয়ে কবে
ফিরেছি ব্যর্থ মনোরথে।
(৩) ছিল যত উদ্বেগ-চিন্তা
করেছ তুমি সব দূর,
যত প্রয়োজন-অভাব মোর
করেছ প্রভূ মঞ্জুর।
(৪) নেই তো কোনও প্রান্তসীমা
মাওলা তোমার দয়া-দানে,
এসেছে যে দুয়ারে তোমার
খুশিই হয়েছে মনেপ্রাণে।
(৫) তব রহমতের অথৈ পাথারে
এ তো সুদূ পরাহত–
তোমারি দুয়ার হতে কেউ
ফিরবে হয়ে আশাহত।

(৬) করুণা কর হে আমার পরে
নিখিলের দয়ালু দাতা,
তুমি তো রহীম তুমিই তো গফুর
পরম করুণাময় পাপীদের ত্রাতা।
(৭) করো না অগো ব্যর্থ-নিষ্ফল
যত চেষ্টা-সাধনা আছে মম,
এসেছি আমি দুয়ারে তোমার
সাহায্য দাও মোর প্রিয়তম।
(৮) শীঘ্রই যেন হয় গো কবুল
আমার এই আকুল মুনাজাত,
তব করুণায় মোর স্নেহের আলী
পায় যেন সাফল্য-নেয়ামত।
(৯) সে-ই তো প্রকৃত সাফল্য
প্রমাণ আছে যার,
এমন প্রমাণ যার অন্ত নেই
শক্তি-ক্ষমতার।
(১০) না-হয় যেন চিন্তা কোনও
দুঃখ-কষ্ট দহন,
মনের আশাগুলো মোর
হয় যেন সব পূরণ।
(১১) তাদের ভুলগুলোর তরে তুমি মাওলা
তাকিও না (ক্ষমা কর),
এরা তোমারই তো বান্দা-দাস
ওদের তুমিই রহম কর।
(১২) ফুল দুটি সদা ফুটে থাক
পাপড়ী মেলে ভবে,
শরী'আত পালনে থাক চির অটল
জীবনায়ূ যতদিন রবে।
(১৩) সুখী-সফল থাক আমরণ
ওরা সব ভাইবোন,
ধরণী তলে সৌভাগ্য যেন

করে ওদের পদচুম্বন।
(১৪) হেমন্তের ফসলে যে আজ
মনোহারী বসন্ত হাওয়া,
সবই তোমার করুণা মাওলা
তোমারই অসীম দয়া।
(১৫) রয় যেন এই করুণা ধারা
যতদিন দেহে আছে প্রাণ,
জীবন-মরণ হোক দামী থেকে
দামী, উজ্জ্বল দীপ্তিমান।

সালামান্তে তোমার আম্মা।

আমার দীর্ঘ সফর, আম্মাজানের ত্যাগ-তিতিক্ষা

আম্মাজানের জন্য কঠিন মুজাহাদা ও পরীক্ষা বরং "জিহাদে আকবর" (বড় জিহাদ) ছিল আমার লম্বা লম্বা সফর। যেগুলো অনেক জানা-নাজানা আল্লাহর হেকমত-প্রজ্ঞার কারণে আমার জন্য বোধ হয় নির্ধারিত ছিল। যেই অসম্ভব স্নেহশীল ও দুর্বল মনের মা আমি লক্ষ্ণৌতে থাকা অবস্থায়ও যদি পত্র লিখতে বিলম্ব হত, তবে অস্থির-ব্যাকুল হয়ে যেতেন, তার জন্য দেশ-বিদেশে লম্বা-লম্বা সফর বিরাট জিহাদ নয় তো কি? হতে পারে আল্লাহ পাকে তাকে এর মেধ্যই জিহাদের অনেক সাওয়াব দান করেছেন।

সম্ভবত ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী সাহেবের নিকট তাফসীর পড়ার অদম্য বাসনায় এবং তার সংশ্রবে উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে লাহোর গেলাম। সেখান থেকে কাদেরী সিলসিলার এক প্রবীন বুযুর্গ, যিনি স্বয়ং হযরত মাওলানা আহমদ আলী সাহেবের শাইখ ছিলেন– সেই বুযুর্গ হযরত খলীফা গোলাম মুহাম্মদ সাহেব দীনপুরীর যিয়ারত ও সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে পাঞ্জাব ও সিন্ধের সীমান্ত এলাকা খানপুর যাওয়ার মনোস্থ করলাম। আর আম্মাজানকে এ বিষয়ে অবগত করলাম। তখন এর জবাবে তিনি আমাকে লিখলেন–

"নয়নমনি আলী!

(আল্লাহ তোমাকে নিরাপদ রাখুন!) (তোমার জন্য রইল) দু'আ এবং অনেক দু'আ। কঠিন অপেক্ষা এবং পরপর বেশ কয়েকটি চিঠি পাঠানোর পর তোমার পত্র হাতে পেলাম। ভীষণ আনন্দ ও প্রশান্তি অনুভূত হয়েছে। কিন্তু যেই তুমি সিন্ধু যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছ, তাতে অবশ্যই চিন্তার সৃষ্টি হয়ে গেছে। জানি না তা কোন দিকে? সেখানো অবস্থা-পরিস্থিতি কেমন আর থাকতেই বা হবে কতদিন? যদি আব্দু ও তালহার মতামত থাকে, তা হলে ভাল। কিন্তু তুমি পূর্ণ অবস্থার বৃত্তান্ত জানালে উত্তম হত; আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতাম। আল্লাহ তোমাকে পূর্ণ সফলতা দান করুন– শুধু প্রত্যাশা এতটুকুই। স্রেফ এ কারণেই এত দূর-দূরান্তে সফর মেনে নিয়েছি। অন্যথায় এমন মনের মানুষদের পক্ষে তা মেনে নেওয়া বিরাট কঠিন এবং অসম্ভব ছিল। তোমাকে তার নিরাপত্তা হেফাযতে সমর্পন করছি। তিনি মহান রক্ষাকর্তা ও সাহায্যকারী। মুখ থুবড়ে পতিত খুপড়ির আমি কী করতে পারি! (কবিতার ভাষায়–)

ترے محفوظ کو کوئی ضرر پہونچا نہیں سکتا
عناصر چہو نہیں سکتے فلک دہمکا نہیں سکتا

"তুমি যারে রক্ষা কর, পারে না কেউ তার ক্ষতি পৌঁছাতে। ছুঁতে পারে না পরাশক্তি তারে; পারে না অন্তরীক্ষ ধমকাতে।"

ব্যাস! এই বলে মনকে বুঝিয়ে রাখি। তবে পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে তার রহমতের ওপর। আল্লাহ তা'আলার কাছে সব সময় প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে নেক কাজের তাওফীক দেন। পৌঁছে দেন ইলমে দীনের সুউচ্চ মর্যাদায়। সদা সর্বদা রাখেন অটল-অবিচল। যাতে দুনিয়া-আখেরাতে সফলকাম হতে পার। আমীন।

আমার মনের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, উভয় জগতের যোগ্যতা-সাফল্য অর্জিত হোক তোমার। তুমি হও ঈর্ষণীয়। আর আমি যেন আমার চেষ্টা-সাধনায় হই সফল-কৃতকার্য। আমীন। তোমার এই সকল সফরই হোক বরকতময়। আমীন। আল্লাহ তা'আলা তোমার দ্বারা এমন কাজই করাক, যা হবে তোমার কল্যাণ, সাফল্য; আমার সুখ-আনন্দ আর মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও খুশির কারণ। আমীন। তোমার ভালমন্দ সম্পর্কে দ্রুত জানিয়ে যাবে। যেখানেই থাক, তিনিই মালিক। তিনিই আমাদের উপর দয়া করবেন। আর যে ফয়েয ও কল্যাণই লাভ হবে, আমাকে জানাবে। দু'আ করি।

সালামান্তে
তোমার আম্মা

দাওয়াত ও তাবলীগের আগ্রহ

আমি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ রহ. এর খেদমতে প্রথমবার হাজির হয়েছি খ্রিষ্ট ১৯৪০ সন/ হিজরী ১৩৫৯ সনে। এখান থেকে আমার জীবনের দ্বিতীয় ধাপ শুরু হয়। এ যেন এক নতুন জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল। তেমনি ছিল এক নতুন ব্যক্তিত্ব ও তত্ত্ব-রহস্যের উন্মেষ। দিল্লি থেকে ফেরার পর আমি আমার কয়েকজন সঙ্গী-সাথী নিয়ে –যাদের বেশিরভাগ দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার শিক্ষক ও ছাত্র ছিলেন– লক্ষ্ণৌ ও তার আশপাশে তাবলীগী জামাতের মূলনীতির উপর এবং হযরত মাওলানা ইলিয়াছ রহ. এর আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবধানে একটু-আধটু তাবলীগী কাজ শুরু করলাম। এত সবচেয়ে বেশি আনন্দ অনুভূত হয়েছে আমার আম্মাজান আর ভাই সাহেবের। দু'জনের আসল বাসনা এবং জীবনের সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা ছিল দ্বীনের প্রচার-প্রসার এবং তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ। কিছুদিন পর বুঝতে পারলাম, আমার কোনও পত্র কিংবা কারও কথাবার্তায় আম্মাজানের ধারণা হয়েছে, আমার সেই প্রথম পর্যায়ের আগ্রহ-উদ্যম নেই। এরই প্রেক্ষিতে তিনি

নিজের উদ্বেগের কথা প্রকাশ করেন। সে সময়কার একটি পত্রে তিনি লিখেন–

"আমার স্নেহের আলী!

(আল্লাহ তোমাকে সুস্থ-নিরপদ রাখুন!)

তোমার পত্র পেয়েছি। তোমার নাশ্‌তা ইত্যাদিতে তৃপ্তি আছে জেনে নিশ্চিত ও প্রীত হয়েছি। নদওয়াতে বেশি থাকার বিরোধী নয় তো আব্দু! সে যদি এর বিরোধী না-হয়, তবে ভাল। তুমি নিজেই বুঝতে পার। তাবলীগে চেষ্টা চালিয়ে যাও। যাতে উত্তরোত্তর উন্নতি হতে থাকে।

প্রথম প্রথম তোমার যে আগ্রহ-প্রেরণা ছিল, সেটা আজ বোধ হয় নেই। আব্দুরও এতে কিছুটা ঘাটতি আছে মনে হচ্ছে। অবশ্য প্রথম অবস্থা অক্ষুণ্ন না-থাকা অতি সাধারণ। তবে ধারবাহিকতা চালু রাখবে অবশ্যই। তাহলে আগ্রহও বাড়তে থাকবে। আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করি, তোমার দ্বারা যেন সেই কাজ নেন, যা তার নেক ও মাকবূল বান্দাদেও দ্বারা করান। গর্ব-অহংকার ও লৌকিকতা থেকে রক্ষা করেন। তোমার উন্নতি-সাফল্য হোক ঈর্ষণীয়। আমীন। আল্লাহ তা'আলা সব কবুল করুন। আমীন।

সালামান্তে

তোমার আম্মা

বাইয়াত ও শ্রদ্ধাবোধ

(হযরত মাওলানা ইলিয়াছ রহ. এর হাতে এবং হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী এর বাইয়াতের নবায়ন)

এ সম্পর্ক এত গভীর হয়ে যায় যে, (১৯৪৩ খ্রিঃ) রজব ১৩৬২ হিজরীতে হযরত মাওলানা আমি অধমের দাওয়াত ও আকাঙ্ক্ষায় বন্ধু, শুভকাঙ্ক্ষী ও খাদেমদের এক বিশাল জামাতসহ লক্ষ্ণৌ তাশরীফ নিলেন। পূর্ণ এক সপ্তাহ অবস্থান করেন নদওয়াতুল উলামার মেহমানখানায়। অধিকন্তু অনুগ্রহ ও দয়া পরবশ আমাদের বাসস্থান দায়েরায়ে হযরত শাহ আলামুল্লাহ রায়বেরলীতে এসে ২৫ জুলাই ১৯৪৩ খ্রিঃ/ ২২ রজব ১৩৬২ হিজরী রবিবার দিন পদধূলি দেন। হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সাহেব রহ., হযরত হাফেয ফখরুদ্দীন সাহেব পানিপতি রহ. সহ আরও ক'জন বন্ধু-শুভাকাঙ্ক্ষী সঙ্গে ছিলেন। আম্মাজান তখন পর্যন্ত কোনও বুযুর্গের নিকট বাই'আত হোন নি। একটি স্বপ্নের প্রেক্ষিতে –যাতে তার খেয়াল ছিল, রাসূলে কারীম সা. তাকে

নিজের বাই'আতে গ্রহণ করে নিয়েছেন– তিনি খোদ আপন কামেল শায়খ পিতার নিকট বাইয়াত হওয়ার প্রয়োজনবোধ করেন নি। কিন্তু এ সুযোগে তার মনে বাইয়াতের আগ্রহণ সৃষ্টি হল। তিনি আমার নিকট সে কথা প্রকাশ করলেন। আমি মাওলানার কাছে আরয করলাম। মাওলানা ইস্তখারার নামায শেষে তৎক্ষণাত তাকে গ্রহণ করে নিলেন। আর আম্মাজানও অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে বাই'আতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। মাওলানার মৃত্যু পর্যন্ত এই সম্পর্ক অটুট-অক্ষুণ্ন ছিল।

মাওলানার ইন্তিকালের পর লক্ষ্ণৌত হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর কোনও শুভাগমনের প্রেক্ষিতে –যা আমাদের এখানে প্রায়ই হত– তিনি নতুন করে বাই'আত হোন। আমাদের পুরা ঘর তখন পর্যন্ত হযরত মাওলানার নিকটেই বাই'আত ছিল। কাজেই এই চিন্তা আসা বিশেষত হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ সাহেব রহ. এর ইন্তিকালের পর অযৌক্তিক কিছু ছিল না।

রাত্রিজাগরণ, দু'আ-দরূদ ইত্যাদির ব্যাপকতা

এক সময় দুর্বলতা ও বার্ধক্য বাড়ছিল। ১৯৩১ হিজরীতে আম্মাজান ভাইজানের পরামর্শে পর পর দু'চোখের ছানির অপারেশন করিয়েছিলেন। অপারেশন সফলও হয়েছিল। কিন্তু লেখাপড়ার ব্যস্ততা এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন না-করার কারণে কয়েক বছর পর দৃষ্টিশক্তি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে দৃষ্টিশক্তি প্রায় চলে যাচ্ছিল। কিন্তু মা'মূলাতের পাবন্দী (নিয়মিত আমলের অনুবর্তিতা), দু'আ-দরূদ, যিকির-আযকার, ওযীফা আর মুনাযাত-আরাধনায় মগ্নতা বাড়ছিল ক্রমেই। বিন্দুও কমছিল না। কেবল কুরআনে কারীম দেখে পড়া সম্ভব ছিল না। যখন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে, আমি তাকে তাহাজ্জুদ নামাযে নিয়ামিত পেয়েছি। দিন দিন রাত্রি-জাগরণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর যত্ন ছিল অত্যধিক। তার প্রকৃত আনন্দ ও বাসনার জন্যে কাম্য সময় ছিল এটাই। তদুপরি সে সময় তার চোখ অধিকাংশ এমনিতেই খুলে যেত। এলার্ম লাগানোর খুব লক্ষ্য রাখতেন। ঘড়ি ঠিক রাখা এবং সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের সঠিক সময় জানার বিরাট গুরুত্ব ছিল। শেষদিকে আমরা চেষ্টা করতাম, দুর্বলতা এবং বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কারণে তিনি যেন খুব একটা আগে না ওঠেন। কিন্তু তিনি মানতেন না। আরও কিছুদিন পর আমার উপর আদেশ ছিল– যখন আমি ফজর নামাযে গমন করি, তখন যেন তাকে বলে দেই। কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই যখন আমি বলতাম– সকাল হয়ে গেছে, তখন

তিনি এমন আক্ষেপের সাথে জিজ্ঞাসা করতেন, যেমন কিছু পূর্বে হয়ে গেছে আর কিছু অপেক্ষা রয়ে গেছে।

বার্ধক্য ও দুর্বলতায় তার সেবা-শুশ্রূষা

জীবনের শেষ দিনগুলোতে তার পক্ষে নিজে চলাফেরাও কষ্টকর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর অশেষ সাহায্যের সঙ্গে তার প্রতি আরও একটি সাহায্য ছিল, তাকে তিনি এমন ভাগ্যবান, অনুগত ও সেবা-শুশ্রূষায় আকুল সন্তানাদি এবং নাতি-নাতকর দান করেছিলেন। যারা কোনও প্রকার নিঃস্বতা-অসহায়ত্বের অনুভূতিই আসতে দেয় নি। এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তার এরূপ সেবা-শুশ্রূষা হয়েছে, যা বড় বড় অভিজাত, সম্ভ্রান্ত সম্মানী পদাধিকারী নারী-পুরুষদের ভাগ্যে জুটে নি। প্রত্যেকেই তার খেদমত করা, তাকে স্বস্তি-আরাম দেওয়া ইত্যাদিকে নিজের জন্য না শুধু সৌভাগ্যের কারণ বরং ইবাদত মনে করতেন। উপস্থিত থাকতেন মনেপ্রাণে। আমার বড় দুই বোন ছিলেন। তারা বছর বছর ধরে তার কাছাকাছিই বরং পাশেই থাকতেন। একজন স্নেহের মাওলানা মুহাম্মদ ছানী, মুহাম্মদ রাবে এবং মুক্ষাদ ওয়াযেহ (আল্লাহ তাদের নিরপদ রাখুন) -এর আম্মা আমাতুল আযীয সাহেবা স্বয়ং এবং তার পৌত্রীগণ খেদমতের জন্য সদা সচেষ্ট উপস্থিত থাকতেন। আরেক বোন– যিনি মাশাআল্লাহ স্বয়ং একজন লেখিকা ও কবি, মাসিক রিযওয়ান এর সম্পাদিকা ও "যাদে সফর" (সফরের পাথেয়)-এর রচয়িতা আমাতুল্লাহ তাসনীম সাহেবা– আম্মাজানের খেদমত ও সান্নিধ্য লাভের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য তার নসীব হয়েছে। তার জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যস্ততা, ওযীফা ও ব্রত ছিল আম্মাজানের খেদমত, দেখাশোনা, অসুস্থ হলে সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করা। সবচেয়ে বেশি তারই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এবং ধারাবাহিকভাবে এই সৌভাগ্য হয়েছে। আমাদের ভাই-বোনদের মধ্যে তিনি এ ধন-রত্ন অর্জন করেছেন সর্বাধিক।

ইসলামের বিজয় আর দ্বীন প্রসারের তীব্র বাসনা

বার্ধক্য সত্ত্বেও অনুভূতি ও শ্রবণশক্তিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি আসে নি। মন-মস্তিষ্ক পুরোপুরি সক্রিয় ছিল নিজ কাজে। কোনও কোনও নতুন কথা ভুলে যেতেন ঠিক; যাদের নতুন আসা-যাওয়া শুরু হয়েছিল, তাদের নাম কখনও কখনও বিস্মৃত হয়ে যেতেন বটে। কিন্তু পুরনো লোকদের খুব স্মরণ ছিল তার। মাঝে মধ্যে এমন এমন পুরনো ছোট্ট কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দিতেন, আমরা আশ্চর্য হয়ে যেতাম। সম্ভবত এটা ছিল তার সময়ানুবর্তিতা, দু'আ-দরূদ ও ওযীফার বরকত। যদ্দরুন শেষ মুহূর্ত পর্যন্তই তিনি অনুভূতিশীল ছিলেন। মন-মস্তিষ্কও কখনও অকেজো-অক্ষুণ্ন হয় নি। সে দিনগুলোতেও তার মনে ইসলামের বিজয়-সাফল্য, দ্বীনের প্রচার-প্রসারের সীমাহীন আগ্রহ-উদ্দীপনা ছিল। এর যে কোনও সংবাদ শুনে তার লোম-পশম সতেজ হয়ে যেত। তিনি ভুলে যেতেন নিজের দুঃখ-ব্যথা। তার মত দ্বীনের সম্ভ্রমবোধ এবং এর বিজয়ের আগ্রহ আমি ভাল ভাল পুরুষদের মধ্যেও দেখি নি। এরই ধ্যান-খেয়াল, এরই চিন্তা-ফিকির থাকত সবসময়। এ দিক থেকে তার মধ্যে কখনও কখনও তার প্রথম শাইখ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ রহ. এর আলো-আভা দৃষ্টিগোচর হত। যখন খুব অস্থির-ব্যাকুল হয়ে পড়তেন, তখন কাব্য-কবিতায় নিজের আবেগ-অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষাগুলো প্রকাশ করতেন। নিজে লিখতে পড়তে পারতেন না বটে –স্নেহের মুহাম্মদ ছানীর কন্যা কিংবা সহদোরা বোনকে দিয়ে লেখাতেন। ইসলামের শত্রু এবং মুসলিম উম্মাহকে অপদস্তকারীদের প্রতি (যাদের আলোচনা সময় সময় সভা-সম্মেলনে হতে থাকত) চরম ঘৃণা পোষণ করতেন। তাদের উপর তার ভীষণ রাগ হত। আর নিশ্চিত তাদের জন্য হেদায়েতের দু'আ কিংবা ধ্বংসের বদদু'আও করতেন।

আমার ব্যাপারে তাঁর সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা ছিল, আমার দ্বারা যেন দ্বীনের শক্তি সঞ্চার হয়, ইসলামের প্রসার ঘটে। মাঝে মধ্যে আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন, আলী! তোমার হাতে কি কখনও কেউ মুসলমানও হয়েছে? আমি বলতাম– হ্যাঁ, হঠাৎ হঠাৎ দু'একজন কালিমা পড়েছে। তিনি বলতেন– আমি চাই মানুষ দলে দলে তোমার হাতে কালিমা পড়ে মুসলমান হোক। একদিন বড় ভারী শ্বাস নিচ্ছিলেন। ছোট বোন বলল– শেষ পর্যন্ত আপনি কি চান? আপনার কি আকাঙ্ক্ষা আলী নবী হয়ে যাক? তিনি বললেন– আমি কি জানি না নবুয়তের পরিসমাপ্তি হয়ে গেছে! আমার আকাঙ্ক্ষা হল, তার হাতে যেন মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ইসলামের বিজয় ডঙ্কা বেজে ওঠে।

সুন্নাত পরিপালন ও দুনিয়া-বিমুখতা

অন্ধকার বরং তীব্র বাতাস, প্রবল বর্ষণ আর বিদ্যুৎ চমকের প্রতি তাঁর বিরাট ভয় ও আতঙ্ক হত। তিনি এসব মুহূর্তে তৎক্ষণাৎ ঘরের কোনায় চলে যেতেন। ব্যস্ত হয়ে পড়তেন দু'আ-দরূদে। এখানেও তার অনিচ্ছাকৃতভাবে একটি সুন্নাতের অনুসরণ ছিল। বয়স যতই বড়ছিল আর দুনিয়ার অবস্থা-পরিস্থিতি ও নানা ঘটনা শুনছিলেন, তার নিজের সে সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকা এবং সেসব অবস্থা-পরিস্থিতি দেখার ব্যাপারে বিরাট দুঃখ ও উদ্বেগ হত। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানশার উপর ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ থাকতেন। প্রায় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতেন– জানি না, আমি সেসব অবস্থা দেখার জন্য বেঁচে থাকব কিনা? জানি না, আল্লাহর আর কি মর্জি আছে? কি কি দেখার বাকি আছে? কিয়ামত-নিকটবর্তী বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলার ব্যাপারে জীবনভর ভয় পেতেন। প্রথম বয়সে কিয়ামতের আলামত আর হাশর-নশরের অবস্থা সম্পর্কে যা কিছু শুনেছিলেন এবং পড়েছিলেন, তা মনের গভীরে গেঁথেছিল। অক্ষরে অক্ষরে ছিল সেসবের বিশ্বাস। সেসব বিপদ-বিপর্যয় থেকে নিজের এবং নিজের সন্তানদের নিরাপত্তার ভাবনা ছিল। দু'আ করতেন তাদের জন্য।

জুমুআর দিন বড় যত্নসহ সূরা কাহাফ পড়ার আমল ছিল নিয়মিত। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে অনেক উপকারীতা ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। দাজ্জালের ফিৎনা থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্যে একে বলা হয়েছে মহৌষধ। আমাকেও এর তাগিদ দিতেন অনেক। প্রায় সময় জিজ্ঞাসা করতেন– সূরা কাহ্ফ কি পড়েছ?

প্রিয় আমল

সে সময় তার সবচেয়ে পছন্দের কাজ ও প্রিয় আমল ছিল কুরআনে কারীমের সেসব রুকু, আয়াত, আসমায়ে হুসনা আর দরূদ শরীফের সেসব বিশেষ শব্দাবলি পাঠ করে করে তার ছোটদের এবং ঘরের লোকদের সকলের উপর দম করা (ফুঁক দেওয়া) –যে সব আয়াত ও দু'আ-দরূদের বিশেষ ফযীলত-উপকারীতা ও বরকত বিভিন্ন বিতাবাদি কিংবা তার নিজের অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করেছিলেন। পড়তে প্রায় ঘণ্টা-পৌনে এক ঘণ্টা লেগে যেত। এরপর দম করার এক দীর্ঘ লাইন পড়ে যেত। শেষে তিনি খুবই দুর্বল ও জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু নিয়মিত আমলগুলো পূর্ণ করা এবং দু'আ-দরূদ পাঠ করায় আল্লাহ মালুম তার কোত্থেকে এত শক্তি আসত যে, তাকে বিরাট সুস্থ শক্তিশালী মনে হত। কয়েক দিন আগের কথা, আমি এবং ভাগ্নে-ভাতিজা বসেছিলাম। তিনি পড়ছিলেন। আমরা সবাই বললাম– এ

শক্তি জানি না কোত্থেকে আসছে? এটা নিছক আত্মিক শক্তি। দম করা পানিও সব সময় রাখতেন। কাছে কি দূরের রুগ্ন-অভাবী লোকজন এসে তা বরাবরই নিয়ে যেত। বলত, এর উপকারীতা আর মহান আল্লাহর দেওয়া সুস্থতা ও বরকতের কথা।

প্রতিবার যখন তাঁর উপর কোনো রোগের আক্রমণ হত, আমরা সবাই তখন ভাবতাম, এই বুঝি নিশিথ প্রদীপ নিভে গেল! শরীরে একরতি প্রতিরোধশক্তিও ছিল না। কেবল ছিল একটি বিশ্বাস, আগ্রহ ও আল্লাহর নামের রবকত। তিনি নিজের মা'মূলাত, নিয়মিত আমলগুলো এবং যিকির-আযকার অত্যন্ত যত্নসহ পূর্ণ করতেন। যে দিন কেটে যাচ্ছিল, আমরা তাকে গনীমত করতাম। আমি কখনও তার বয়স হিসাব করতাম না আর না কাউকে করতে দিতাম। কেননা আল্লাহর রহমতের এ ছায়া এবং মায়ের পদতলের এ জান্নাত আমাদের ঘরে যতদিন থাকবে, পুরোই মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা।

আমার ভূপাল সফর, আম্মাজানের প্রতিক্রিয়া

অবশেষে যার ভয় ছিল এবং যা অপছন্দনীয়, সেই মুহূর্তটিএসে গেল। ২৩ আগস্ট ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি যখন একটি রোগের আক্রমণ থেকে বেঁচে ওঠলেন, তখন আমি নিবেদন করলাম– দিল্লি ও ভূপালে একটি সফরের প্রয়োজন। কিন্তু সবার আগে চাই আপনার খুশি ও সন্তুষ্টি। আমি অপারগতার পত্র লিখেছিলাম দিল্লি। কিন্তু তাদের মনের আকুলতা দেখে আপনাকে বলাই ভাল মনে করলাম। এটা ছিল তাঁর জন্য সবচেয়ে কঠিন পরাকাষ্ঠা, বিরাট বড় মুজাহাদা। কিন্তু তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে জবাব দিলেন– আল্লাহ তোমাকে যে কাজের জন্য বানিয়েছেন, তার জন্য নিশ্চয় যাবে। তবে ফিরবে কবে নাগাদ? আমি বললাম– আগামী শুক্রবার, নতুবা শনিবারে তো অবশ্যই ভুল হবে না (এটাই সেই দিন, যেদিন তিনি ইন্তিকাল করেন)। আম্মাজান বললেন– আচ্ছা যাও! যাত্রাকালে আমাকে তিনি নিয়মমাফিক বিদায় জানালেন। পড়লেন আয়াতে কারীমা আর সুন্নাত দু'আসমূহ।

মৃত্যু রোগ এবং একটি পুণ্যময় স্বপ্ন

২৮ আগস্ট। সকাল বেলা। ভূপালে বসে আছি। আমার স্নেহের মুহাম্মদ ছানীর তারবার্তা পেলাম– নানী সাহেবার শরীর ভাল নয়। আপনি শীঘ্রই ফিরে আসুন। যে পেরেশানীর মুহূর্তে সেখান থেকে ফিরে এসেছি, আল্লাহ পাক যেন সে পেরেশানী আর না দেখান। সব চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল, আমি যেন তার জীবদ্দশায় পৌঁছে যাই। ভাইজানের দাফন কাজে শরীক না-থাকার

দাগ সারাজীবন থাকবে। মৃত্যু একটি চিরন্তন সত্য। যে কোনও দিন তা এসে হাজির হবে অবশ্যই। একে টলানো বা পিছিয়ে দেওয়া যায় না। আল্লাহ্ পাক অনুগ্রহ করলেন, আমি বৃহস্পতিবার ২৯ আগস্ট সকালে রায়বেরলী এসে পৌঁছালাম। জানতে পেলাম, আমার যাত্রা করার পরের দিনই রাত্রিবেলা আম্মাজান যখন তাহাজ্জুদের জন্য ওঠলেন এবং প্রস্রাবের জন্য তাকে চৌকিতে বসানো হল, তখন অন্ধকার আর তন্দ্রার কারণে সবকিছু পরিষ্কার বুঝা গেল না, হাত ছুটে গেল। তিনি পড়ে গেলেন মাটিতে। এতে তার কাঁধ এবং হাতের কব্জির হাড়ে চোট লাগল। তারবার্তায় আমার প্রস্থানের সংবাদ তিনি শুনেছিলেন। এতে তার বিরাট আনন্দ হয়েছিল। আমি এসে হাজির হলে তিনি বললেন– অর্ধেক শক্তি ফিরে এসেছে। সালাম করলেন। কাছে ডাকলেন। বললেন– আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি, "আমার শরীরের লোম-পশম থেকে আল্লাহর হাম্‌দ-ছানা (প্রশংসা-স্তুতি) ঠিকরে পড়ছে। আর আশ্চর্যরকমের আনন্দ-আগ্রহ হচ্ছে।" আমি বললাম– এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। খুবই বরকতপূর্ণ স্বপ্ন। শুক্রবারও অনেকটা ভালই কেটেছে। তবে হাড়ের ব্যথা ছিল প্রচণ্ড।

অন্তিম যাত্রা

শনিবার রাত কাটে অস্থিরতায়। যোহর নামায পড়েন সচেতন-স্বজ্ঞানে। অঙ্গুলি টিপে যিকির শুরু করেন। এরপরে পরযাত্রার ঘাঁটি শুরু হয়ে যায়। আপন তিন মরহুমা বোনের নাম নিয়ে বলেন– তারা লক্ষ্ণৌ গিয়েছেন। এরপরেই মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ইসমে যাত "আল্লাহ আল্লাহ" যিকির ধ্বনী চলতে থাকে। যখন এ আওয়াজ বন্ধ হল, তখন বুঝা গেল, তিনি আমাদের সকলকে ছেড়ে তার সেই সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের কাছে পৌঁছে গেছেন, যার নাম নিতেন সারা জীবন। সর্বদা কড়া নাড়তেন যার রহমতের দুয়ারে।

ياأيتها النفس المطمئن إرجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى

"হে প্রশান্ত মন! তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। তারপর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও আমার বান্দাদের এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।" (সূরা ফাজ্‌র ঃ ২৭-৩০)

পরের দিন রবিবার ৭ জুমা উখরা ১৩৮৮ হিজরী/১লা সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে দেশবরেণ্য বহু বুযুর্গ, আলেম-উলামা, ছাত্র-শিক্ষক এবং তাবলীগ

জামাতের অসংখ্য লোকজন তার জানাযার নামায পড়েন। আর চিরদিনের জন্য আব্বাজান মাওলানা হাকীম সাইয়িদ আব্দুল হাই রহ. এর পাশে এবং শাইখুল মাশায়েখ হযরত শাহ আলামুল্লাহ রহ. এর মুহতারাম সহধর্মিনীর পদতলে আরাম নিদ্রায় শায়িত হন। পূর্ণ সাতচল্লিশ বছরের দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর গিয়ে মিলিত হন নিজের সুযোগ্য স্বামী ও জীবনসঙ্গীর সাথে। কি আশ্চর্য! ঠিক এ মাসেই (জুমাঃ উখরা ১৩৪১ হিঃ) আব্বাজান ইন্তিকাল করেছিলেন।

দেশ-বিদেশ থেকে যেসব শোকবার্তা, সমবেদনাপত্র এসেছে, তা থেকে মাগফেরাতের দু'আ এবং অনেক ব্যাপকভিত্তিক ঈছালে ছাওয়াবের খবর পাওয়া গেছে। তা ছাড়া বুযুর্গানে দ্বীন, সমসাময়িক উলামা-মাশাইখ ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের শোকপত্র থেকে আল্লাহর রহমত এবং তার মাকবুল হওয়ার আশাবাদ সৃষ্টি হয়।

যেসব রমণী আর যে পুরুষ এ বিষয়টি পড়বেন, তাদের কাছেও নিবেদন রইল, আম্মাজানের জন্য মাগফেরাতের দু'আ ও ছাওয়াব রেছানীতে কার্পণ্য করবেন না। কেননা দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণনকারী সকলের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এরই। এতেই তারা খুশি হন। এর মুখাপেক্ষী নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সকলেই।

আমার বোন মরহুমা আমাতুল্লাহ তাসনীম সাহেবা

পূর্ণ অর্ধশতক পঞ্চাশ বছরের ভাইবোনের মহাব্বত, সহাবস্থান, দুঃখ-সুখে ও হাসি-কান্নায় অংশীদারত্ব, পড়াশোনা ও অধ্যয়নে একতা-সহানুভূতি, লেখালেখি ও রচনা-গ্রন্থনায় পরামর্শ ও কল্যাণ কামনা, তারপর হজ্বের দীর্ঘ সফরে একসঙ্গে থাকা এবং শেষদিকে অসুস্থতা এবং দুনিয়া থেকে বিদায়ের দীর্ঘ ও মর্মস্পর্শী ঘটনা আর তারপর এক ব্যথা ভারাক্রান্ত ভাইয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশ –যার অন্তর-আত্মায় এই দূর্ঘটনার আঘাত লেগেছে এখনও বেশিদিন হয় নি– বিরাট কঠিন কাজ। ইতিহাস ও জীবনচরিত নিয়ে অত্যূক্তি ছাড়াই শত-সহস্র পৃষ্ঠা কালো করার পরও কলম এই বৃত্তান্ত লিখতে গিয়ে থমকে দাঁড়াচ্ছে বারবার। কারণ, হয়তো এতে যুগের অবস্থা-প্রকৃতি অপেক্ষা "আত্মকথা"-র অংশ বেশি হবে। সেই বৃত্তান্ত শোনানোর দ্বারা এমন অনেক ঘটনা ও দৃশ্যপট চোখের সামনে ভেসে ওঠে, যার দ্বারা জীবন্ত হয়ে যায় পুরনো ক্ষত। চক্ষু যুগল হয় বেঘোর অশ্রুসজল। মনকে শান্ত করা ছাড়া তার বৃত্তান্ত শোনানো এবং লেখা সম্ভব নয়।

পঞ্চাশ বছরের কথাও বলেছি, জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার সময়ের কথা ভেবে। নতুবা শৈশবের দিনগুলোও এতে যোগ করে নিলে এই সময় সীমা আরও দীর্ঘ হয়ে যায়। আমার এবং মরহুমা বোনের মধ্যে মাত্র ছয় বছরের ছোট-বড়োর ব্যবধান ছিল।

তার জন্ম হয়েছে ১২ জুমাঃ উলা ১৩২৬ হিজরী মোতাবেক ১৮ জুন ১৯০৮ খ্রিঃ রোজ বৃহস্পতিবার আর আমার জন্ম হয় ৬ মহররম ১৩৩৩ হিজরী (১৯১৪ খ্রিঃ) সনে। সম্ভবত ১৯২০-২১ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনও এক সময়ের কথা। লক্ষ্ণৌর আমীনাবাদের সেই মহল্লায়, সেকালে যাকে ঝাউলাল বাজার বলা হত আর আজ তার মাথায় "মুহাম্মদ আলী লেন" লেখা ফলক লাগানো আছে– আমার আব্বাজন মাওলানা হাকীম সাইয়িদ আব্দুল হাই সাহেবের একদম সড়কের এক প্রান্তে বাড়ি ও দাওয়াখানা ছিল। আজও আল্লাহর দয়ায় সেই বাড়ি আমাদের ব্যবহারাধীন রয়েছে। এ বাড়িতেই বসবাস করত আমাদের ছোট্ট পরিবার। সে পরিবার ছিল বাবা-মা আর চার ভাই-বোনদের নিয়ে। দু'ভাই, দু'বোন। বড় ভাই যিনি পরবর্তীতে ডা. হাকীম মৌলভী সাইয়িদ আব্দুল আলী সাহেব বি.এস.সি., এম.বি.বি.এস., নাযেমে নদওয়াতুল উলামা নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। তার ছোট এক বোন আমাতুল আযীয সাহেবা [স্নেহের মৌলভী মুহাম্মদ ছানী মরহুম, মুহাম্মদ রাবে', মুহাম্মদ ওয়াযেহ (আল্লাহ তাদের নিরাপদ রাখুন)- এর আম্মা]। আল্লাহ পাক তার জীবনে বরকত দান করেছেন। তিনিই আজ আমাদের ক্ষুদ্র পরিবারের বরকত এবং বুযুর্গদের স্মৃতিচিহ্ন। তার ছোট আমাতুল্লাহ তাসনীম সাহেবা। যাকে বংশের মধ্যে বিবি আয়েশা বলেই সকলে চিনত এবং ডাকত। আর আজ যিনি আল্লাহর রহমতের প্রান্তে পৌঁছে গেছেন। আর সবার ছোট ছিল এ অধম লেখক। যার বয়স ছিল তখন ছয়-সাত বছর। আমার বড় বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল আগেই। তিনি অধিকাংশ শ্বশুর বাড়ি রায়বেরলী আর ভাবী সাহেবা তার বাপের বাড়ি হেন্সু চলে যেতেন। দু'জনই সেখানে কয়েক মাস পর্যন্ত অবস্থান করতেন। এজন্য আম্মাজানের বেশিরভাগ সম্পর্ক ও সহাবস্থান ছিল উক্ত মরহুমা বোনের সঙ্গেই।

আমাদের বংশ আলেম-উলামা ও লেখকদের বংশ। আব্বাজান ছিলেন তার সময়ের মহান লেখকদের একজন। বংশীয় উত্তরাধিকার সূত্রতার প্রভাবগুলো হয়ে থাকে বিরাট শক্তিশালী। তা চালু থাকে প্রজন্মের পর প্রজন্মে। শিশু-কিশোর ছেলেমেয়ে সকলের মধ্যে তার প্রভাব কমবেশি পরিলক্ষিত হয়। কিছু ঐ পূর্বসূরীদের প্রভাবে, কিছু আব্বাজানের আগ্রহ-মনোযোগীতায় আমাদের পুরো পরিবারের উপর এই বই-পুস্তকে (অধ্যয়ন)

আগ্রহ ছিল ছায়াময়। বই-পুস্তক পড়ার আগ্রহ-উদ্যম অনেকটা আগ্রহের সীমা ছাড়িয়ে বদ-অভ্যাস ও ব্যাধি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। ছাপা কোনও জিনিস হাতে পেলে তা পড়া ছাড়া কেউ ফেলতে পারত না। আমাদের ভাইবোনের যৎসামান্য যে পয়সা হাতখরচের জন্য জুটত কিংবা কোনও বুযুর্গ যাওয়ার সময় সেকালের বংশগত রীতি অনুযায়ী শিশুদের যে অর্থকড়ি দিয়ে যেতেন, তা খরচের একটি মাত্র প্রিয় খাত ছিল অর্থাৎ তা দিয়ে কোনও বই-পুস্তক কেনা। এ প্রসঙ্গে খোদ আমার একটি হৃদয়গ্রাহী ঘটনা শুনুন। একবার আমার হাতে এরূপ কিছু টাকা এসে গেল। তা দু'-এক আনা থেকে বেশি ছিল না। আমি তখন এতই ছোট ছিলাম যে, আমার এতটুকুও জানা ছিল না– বই-পুস্ত ক কেবল বই বিক্রেতার কাছেই পাওয়া যায়। আর প্রত্যেক জিনিসের দোকান ও বিপনন কেন্দ্র আলাদা আলাদা। আমি আমীনাবাদ গেলাম। ঘণ্টাঘার পার্কের সম্মুখে বড় বড় দোকানের যে লাইন রয়েছে, তন্মধ্যে কোনও এক ঔষধের দোকানে গিয়ে দাঁড়ালাম। সম্ভবত "সালুমন কোম্পানী" ছিল। আমি পয়সা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, আমায় বই দিন। দোকানে কর্মরত লোকটি মনে করলেন, কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সরল ছেলে। ঔষধের দোকানে কি আর বই পাওয়া যায়। ঔষধের তালিকা ছিল উর্দূতে। তিনি তা-ই বাড়িয়ে দিলেন এবং পয়সাও ফিরিয়ে দিলেন। আমি তো খুশিতে আটখানা। বইও পেলাম আর পয়সাও হাতে রইল। খুশি মনে ফিরে এলাম ঘরে। আর তা-ই দিয়ে সাজালাম নিজের কুতুবখানা, যা আব্বাজানের ওখান থেকে কুড়িয়ে পাওয়া তার পরিত্যক্ত বই-পুস্তক দ্বারা বানিয়েছিলাম। যেগুলো তিনি ফেলে দিতেন ময়লার ঝুড়িতে। এমনই আগ্রহ ছিল আমার দু'বোনের। বই ছাড়া তাদের স্বস্তি আসত না। সেকালে জনৈক বইবিক্রেতা আমাদের গলিতে মাঝেমধ্যেই আসত। আর হাঁক ছাড়ত হরিণীনামা, নূরনামা, ধাত্রী হালীমার কাহিনী, নবী পরিবারের মুজিযা, মীলাদনামা ইত্যাদি বলে বলে। তার হাঁক এখনও আমার কানে বাজে। চোখের পাতায় ভাসে সেই দৃশ্য। সে উক্ত বই-পুস্তকের ছন্দ কবিতাগুলো গেয়ে গেয়ে পড়েও শোনাত। এদিকে তার হাঁক কানে আসল। ওদিকে দু'বোনের পক্ষ থেকে হুকুম পেলাম– অমুক বই নিয়ে এসো! গেলাম দৌড়ে দৌড়ে। কিনে আনলাম বই।

বলা বাহুল্য, আমাদের পরিবার আকীদা-বিশ্বাস ও মতাদর্শে ছিল হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ রহ. এবং হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ. এর কঠোর অনুসারী। তাদের প্রভাব-ক্রিয়া আমাদের মধ্যে এমনই শেকড় ছড়িয়ে বসেছিল, যার ফলে ভিত্তিহীন অমূলক আর অনির্ভরযোগ্য জিনিস, যার দ্বারা ঈমান-

আকীদায় ত্রুটি আসে– সেগুলো ঘরে কখনও স্থান পায় নি। আকীদার বিষয়ে পুরুষদের চেয়ে নারীরা ছিল বেশি কঠোর। এজন্য "নবী পরিবারের মুজিযা" প্রভৃতি জাতীয় বই-পুস্তকের তো এখানে স্থান ছিল না। তবে সীরাত, জীবনচরিত, বুযুর্গদের ঘটনাবলি এবং অক্ষতিকর (যাতে ক্ষতি নেই) হৃদয়গ্রাহী বই-পুস্তক পদ্যে হোক চাই গদ্যে হাতে হাতে চলতে থাকত। সেসব বই-পুস্তকের দাম আর কত ছিল। কোনোটির দুই পয়সা, কোনোটির চার পয়সা, আর দাম বেশি হলে দুই আনা-চার আনা। দু'বোনের একজন সুর দিয়ে মজা করে পড়তে শুরু করলেন। আর যতক্ষণ না পড়ে শেষ করলেন, তাদের স্বস্তি আসল না। যে সময় "আন্-নদওয়াহ"-এর পাতায় "মেরী মুহসিন কিতাবেঁ" (আমার প্রিয় বইগুলো) শিরোনামে এ জাতীয় প্রবন্ধগুলো প্রকাশ হচ্ছিল, সেসময় আমর বলার কারণে কিংবা স্বআগ্রহে এই মরহুমা সহোদরা বোনও এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখলেন। যার শিরোনাম ছিল "মেরী বে-যবান উস্তানিয়াঁ" (বা আমার নির্বাক শিক্ষিকা)। তার সে প্রবন্ধ জলন্ধরের চিন্তাশীল নারী বিষয়ক পুস্তিকা "মুসলিমা" তে ছাপা হয়েছে।

সেকালেই একটি বই সম্ভবত উর্দু পাঠ্যের একটি অংশ হিসেবে আমি পড়েছি, সেটি আমার হাতে আসল। আর তা ছিল মৌলভী ঈসমাঈ মীরাঠী বিরচিত "সফীনায়ে উর্দূ" বইখানা। এই কচি বয়সে উক্ত বইখানার নির্বাচিত বিষয়বস্তু ও কবিতাগুলো –যা ছিল উর্দূ ভাষার বিশিষ্ট গদ্যকার, প্রবন্ধকার ও কবি-সাহিত্যিকদের কলমে– আমাদের মেধা-মননে আর মন-মাস্তিষ্কে বিরাট প্রভাব ফেলে, বিশেষত মাওলানা যাফর আলী খানের কবিতা "রাজা দশরথের গল্প ও তার বক্তব্য"। যাতে তিনি অত্যন্ত প্রভাবময় ভঙ্গিতে রাজা দশরথের হাতে জনৈক ঋষির ছেলে (যে তার বৃদ্ধ পিতার জন্য পানি আনতে সকাল সকাল নদীতে গিয়েছিল আর তার তীরে ধরাশায়ী হয়ে গিয়েছিল)-এর হৃদয়বিদারক কাহিনী শুনিয়েছেন। এতে কবিত্বের রত্ন, প্রভাবময় দৃশ্যপট আর আবেগ-উচ্ছাস চিত্রায়নের যোগ্যতা চূড়ান্তভাবেই পরিলক্ষিত হয়। আমরা দু'ভাইবোন এ কাহিনী মজা করে বারবার পড়েছি। বিস্ময়ের কিছু নেই! এর কোনও কোনও অংশে আমাদের মন উদ্বেলিত হয়ে যেত। চক্ষুদ্বয় হত অশ্রুসজল। উক্ত কবিতার শুরু ছিল!

ابر تہا چہایا ہوا اور فصل تہی برسات کی
تہی زمیں پہنے ہوئے وردی ہری باغات کی

"ছেয়েছিল মেঘ আর মৌসুম ছিল বরষার,

সেজেছিল পৃথিবী অপরূপে শ্যামল বাগিচার।"

এরপর আসে তার দ্বিতীয় কবিতা। সেটি মূসা নদীর তুফান সম্পর্কিত। যার শুরু ছিল :

آے نامراد ندی تجہ پر غضب خدا کا
الٹاہے تونے تختہ یاران آشنا کا

(ব্যর্থ হে নদী! খোদার ক্রোধ তোমার পরে;
উল্টালে তুমি আপন বন্ধুর আসন ধরে)।

আমরা স্বয়ং বেশ কয়েকবার সমুদ্র উপকূলে– যেখানে মারাত্মক প্লাবন আসে– সেখানে বসবাস করার কারণে এ অভিজ্ঞতা আমাদের যথেষ্ট হয়েছিল। এজন্য আমরা সেই বিপদের অনুমান করতে পারতাম, মূসা নদীর প্লাবনে আক্রান্ত লোকদেরকে যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। উক্ত বিষয়ে সংকলিত গদ্য-পদ্যগুলো বারবার পড়ার কারণে আমাদের মধ্যে বেশ উত্তম গদ্য এবং ভাল কবিতার স্বাদ গ্রহণের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে।

আল্লাহর অনুগ্রহে আমাদের ঘরে মেহমানদের আসা-যাওয়া রীতিমত চলতে থাকত। তাদের কোনও সংখ্যা ও সময় নির্দিষ্ট ছিল না। সেকালে অভিজাত সম্ভ্রান্ত লোকদের নীতি ছিল, কোনও বংশের কোনও ঘর-পরিবার যদি কোনও শহরে থাকত আর সে বংশের কাউকে– কাছের হোক চাই দূরের– যে প্রয়োজনেই শহরে আসতে হত, তবে সে ঐ ঘরেরই মেহমান হত। এসব মেহমানের জন্য খাবার প্রস্তুত করা একা পাঁচকীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। খাবার রান্নার জন্য বাবুর্চি/আয়া নিযুক্ত ছিল। তার বোঝা সবচেয়ে বেশি আমার ঐ ছোট বোনের উপর পড়ত। আম্মাজানের খাবার রান্না করা, সেলাই ও কারুকাজে বিরাট দক্ষতা ছিল। এক্ষেত্রে তিনি নতুন নতুন আবিষ্কার উদ্ভাবন করতে থাকতেন। তিনিই এ বোনকে এসব কাজের জন্য ভালভাবে তৈরী করে দিয়েছিলেন। আর অধিকাংশ তার কষ্ট-শ্রম এবং সময়-অসময়ে মেহনতের কারণে ভাইজানের কান্না এসে যেত। কখনও কখনও তো সাহস যোগানোর জন্যে তিনি তার পাশে গিয়ে বসতেন। সহযোগিতারও চেষ্টা করতেন।

আমাদের ঘরগুলোতে মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার ঘরেই হত। সহোদরা বোন তখন পর্যন্ত সকল শিক্ষা পেয়েছিলেন আব্বাজন এবং আপন চাচা মাওলানা আযীযুর রহমান নদভী সাহেবের কাছ থেকে। এ শিক্ষা কুরআনে কারীম, উর্দু আর সামান্য ফার্সী জ্ঞান থেকে বেশি ছিল না। গ্রহণযোগ্য প্রিয় কিতাব ছিল "ছমছামুল ইসলাম" তথা "ইসলামের তীক্ষ্ণ তরবারী" নামক আল্লামা

ওয়াকেদী বিরচিত আরবী গ্রন্থ "ফুতূহাতু শাম"-এর কাব্যানুবাদ। যাতে প্রায় পঁচিশ হাজার শ্লোক আছে। এটি যেন সেকালের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য ইসলামের রাজকাহিনী ছিল। এ কিতাবখানা বংশেরই একজন এই দীন লেখকের আব্বাজানের ফুফা মুনশী সাইয়িদ আব্দুর রায্যাক সাহেব কালামী টৌঙ্কী বিরচিত কবিতা। তিনি ছিলেন সুনিপুন কথাশিল্পী কবি। জেহাদী প্রেরণা এবং ইসলামী উদ্দীপনা পেয়েছিলেন তিনি তার পিতামহ সাইয়িদ আহমদ শহীদ রহ. এর উত্তরাধিকার সূত্রে। একে কিতাব কি বলব! মনে হত, জিহাদের উত্তপ্ত রণক্ষেত্র বিরাজ করছে। ঝনঝন করছে ঝলমলে তরবারী। মুজাহিদগণ অঞ্জলিতে মাথা রেখে প্রাণপণে লড়াই করছেন। বইটির বাচনিক প্রভাবে পাঠকের কণ্ঠ ভারী আর চোখ হয়ে যেত অশ্রুসিক্ত। শ্রোতাদের আপাদমস্তকে থাকত না হুঁশ। আমাদের বংশে দীর্ঘকাল ধরে এ রীতি চলে আসছিল। কোনও দুর্ঘটনা কিংবা উৎসবকালে ঘরে ঘরে উক্ত কিতাব দ্রুত পাঠ করতে সক্ষম কোনও নারী পড়ে শোনাত আর বংশের সকল স্ত্রী-কন্যা-জায়ারা তা শুনত। আমাদের বংশে বইটি পাঠের বিশেষ আকর্ষণ ছিল দু'জনের। বড়-বৃদ্ধদের মধ্যে আমার আপন খালা বিবি সালেহার– যিনি কুরআনে হাফেযাও ছিলেন। আর আমার ঐ মরহুমা বোনের। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সহোদরা সেই বোনের কাছে এ বইটি বিরাট প্রিয় ছিল। এর দ্বারা তিনি নিজের রচনাবলী ও কাব্যচর্চায় উপকৃত হয়েছেন।

সে সময় তিনি কোথাও মাওলানা সুলাইমান নদভী এর প্রসিদ্ধ রচনা "সীরাতে আয়েশা"-এর বিজ্ঞাপন দেখলেন। আজ মনে নেই, মরহুম ভাইজান কি এ বইয়ের আলোচনা করেছেন নাকি এর বিজ্ঞাপনের উপর চোখ পড়েছে! যাহোক, ঐ সহোদরা বোন বইটি সংগ্রহ করলেন এবং একে মনমন্ত্র বানিয়ে নিলেন। এর সাথে সম্পর্কের কয়েকটি প্রকাশ্য কারণও ছিল। প্রথম তো স্বানামের সম্মান ও গৌরব। দ্বিতীয়ত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. এর জ্ঞানের গভীরতা ও স্বকীয়তা, পূর্ব থেকেই তার অন্ত-আত্মায় যার স্থান ও মূল্য ছিল। মোটকথা, এ বইটি তিনি কেবল পড়েই শেষ করেন নি বরং এর বিষয়বস্তুগুলো নিজের মধ্যে গেঁথে নিয়েছেন এবং আকষর্ণ করছেন। এটা তার জন্য বিরাট পাথেয় ও পথপ্রদর্শক প্রমাণিত হয়। সেকালে আর বিস্ময়ের কিছু নয় এ বইয়েরেই বরকতে তিনি আরবী পড়তে শুরু করেন। তখন আমারও আরবী ভাষা শিক্ষার শিশুকাল ছিল। কিন্তু আমি ঘরের বাইরে বিশিষ্ট বিখ্যাত ও সুযোগ্য অভিজ্ঞ উস্তাদগণের নিকট পড়তাম। যার মধ্যে শাস্ত্রীয় পণ্ডিৎ শায়খ খলীল আরব ইয়ামেনী ভূপালীর স্থান ছিল সবার শীর্ষে। একারণে আমি

তাকে কিছুটা সাহায্য করার যোগ্য হয়ে গিয়েছিলাম। সবচেয়ে বড় সাহায্য তিনি পেয়েছেন আপন ফুফা মাওলানা সাইয়িদ তালহা সাহেব হাসানীর কাছ থেকে। যিনি গরমের ছুটিতে লাহোর থেকে বাড়ি চলে আসতেন। তার মধ্যে ছিল জ্ঞানকে সুরা পান করানোর অপূর্ব যোগ্যতা। নাহব-ছরফের জরুরী মাসায়েল চর্চা ও রপ্ত করানোর ক্ষেত্রে ছিল তার লম্বা হাত। এ বিষয়ে আরও ছিল তার আশ্চর্য আশ্চর্য রসবচন। ইতিহাস ও কাব্য কবিতায়ও ছিল তার বেশ সুরুচি। সহোদরা বোনের মানসিকতা সব সময়ই ছিল ভারসাম্যপূর্ণ। আর এ মানসিকতার পৈত্রিক সম্পদ আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে কেবল তিনিই পেয়েছিলেন। "গুলে রাণা" (কমনীয় ফুল) ছিল ঘরের সম্পদ। এটা তিনি এতবার পড়েছেন, যেন তিনি এর হাফেয ছিলেন। বংশের মধ্যে রাত্রি-জাগরণের প্রতিযোগিতা অনেক পুরনো। এতে অতিরঞ্জন না হলে উপকারীতাও প্রচুর। এখানে ভারী মুশকিলেই কেউ তার থেকে অগ্রগামী হতে পারত। কবিতা নির্বাচনের বিষয়টি ছিল খুবই স্বচ্ছ-পবিত্র। পরবর্তী সময়ে তিনি এ বিষয়ে বইও রচনা করেছেন। যা উস্তাদগণের পছন্দনীয় ও পবিত্র কবিতাসমূহের উত্তমতর সংকলন হয়ে গেছে। তার বই-পুস্তক সংগ্রহের আগ্রহ ছিল প্রচুর। প্রাচীন আদলে নির্মিত ঘরে তিনি এর জন্য পৃথক একটি স্থান নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন, যেখানে তিনি নিজের বই-পুস্তকের সংগ্রহ সাজিয়ে রাখতেন।

অধ্যয়ন ও লেখালেখির এ আগ্রহের কারণে মনে করা যাবে না যে, তিনি হাতের কাজ, সেলাই, কারুকাজ, রান্নাবান্না ইত্যাদির সেসব কাজ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিলেন কিংবা সেব কাজের প্রতি তার ভীতি ছিল, যেগুলো নারী ও মেয়েদের জন্য জরুরী মনে করা হয়। তিনি এসব কাজের বিরাট আগ্রহী, সুরুচিবান ও সুদক্ষ ছিলেন। এতটুকুও কম ছিলেন না সমবয়সী কারও থেকে।

২৫ নভেম্বর ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ। বিয়ে হয়ে গেল তার। আপন মামাত ভাই মাওলানা সাইয়িদ আবুল খায়ের হাসানী সাহেবের সঙ্গে। এ সম্বন্ধ তো ছিল অনেক পুরনো। কিন্তু বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনার কারণে বিলম্ব হচ্ছিল বরাবর। তখন পর্যন্ত তার বয়সও বেশি হয় নি। সহোদরা মরহুম বোনের জীবনে সুখের দিন ছিল সেই প্রথম কয়েক বছর, যা তিনি আপন পিতৃতূল্য স্নেহশীল মামা ও শ্বশুর মাওলানা হাফেয সাইয়িদ উবাইদুল্লাহ সাহেব রহ. (হযরত সাইয়িদ শাহ যিয়াউন্নবী সাহেব রহ. এর পুত্র, তার ইন্তিকাল হয়ে গেছে মে

১৯৩৮ হিজরীতে)- এর স্নেহের ছায়াতলে কাটিয়েছেন। মরহুম ভাই সাইয়্যিদ আবুল খায়ের সাহেব ১ম জুন ১৯৭০ খিষ্টাব্দ ইন্তিকাল করেন।

মরহুম ভাইয়ের ঔরসে তার তিনটি সন্তান জন্ম নিয়েছে। দুই মেয়ে এক ছেলে সালেম। এরা সবাই তাকে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা দিয়ে যায় দুধের বয়সেই। এমন শিক্ষিত দম্পতি আমাদের বংশে আরেকটি পাওয়া মুশকিল হবে। কিন্তু অনেক জানা-অজানা হেকমত ও রহস্যের কারণে, যার জ্ঞান একান্তই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় ও পরম করুণাময় অতিশয় দয়ালু আল্লাহ পাকেরই আছে আর কারও নেই; তার ভাগ্যে সুখ-আনন্দের এ দিনগুলো ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে শেষ হয়ে গেছে। তার জীবনে এমন দাগ লেগে যায়, যা ভারতের সম্ভ্রান্ত বংশ ও পরিবারের জন্য স্বাভাবিক অবস্থায় সহ্য করার নয়। কিন্তু তিনি নিজের ঈমানী শক্তি এবং অনেকটা শিক্ষামূলক কর্মব্যস্ততা আর আগ্রহ-রুচির সাহায্যে একে না কেবল সহ্যই করেছেন বরং তার জীবনের এ দিকটি তার শত-সহস্র উন্নতি ও সৌভাগ্যের কারণ হয়েছে। প্রকাশ পেয়েছে طے شود این جادہ باهے گاهے (তথা আহা! কালে কালে হয়েছে অতিক্রম এ পথ) প্রবাদ বচনের বাস্তবচিত্র। তার নিঃসঙ্গ একাকিত্বের এই বাকী জীবন ত্রিশ/পঁয়ত্রিশ বছরের পুরো সময়টাই কেটেছে আপন ভাইদের কাছে। এ ঘরের দরজা দিয়েই তিনি শেষ বিদায় নিয়ে আপন আব্বাজানের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত হয়ে গেছেন।

এটা সে যুগের কথা, যখন তার সময়গুলো লেখাপড়া, আল্লাহর সামনে হাত প্রসারিত করা, নিজের ব্যথা-ভারাক্রান্ত মনের কথাগুলো বলা, দু'আ-মুনাজাত, যিকির-আযকার, তিলাওয়াতে কুরআন, রচনা-গ্রন্থনা ছাড়া কোনও কিছুতে ব্যয় হত না।

পরীক্ষা ছিল কঠিন। তার মন ছিল দুর্বল, ব্যথাতুর ও সীমাহীন অনুভূতিপরায়ণ। খুব সম্ভব ছিল, তার মন-মস্তিষ্কে এমন প্রভাব পড়ে যাবে, যা তিনি সহ্য করতে পারবেন না। এ অবস্থা-প্রেক্ষিতে মরহুম ভাইজান (যিনি ছিলেন একজন স্নেহশীল ভাই আবার দরদী অভিজ্ঞ ডাক্তারও) তার চিকিৎসার জন্য একটি প্রক্রিয়া আবিষ্কার করলেন তিব্বে নববী (নবীজীর চিকিৎসাবিজ্ঞানের) আলোকে। তিনি তার মেধাকে ব্যস্ত আর মনকে প্রশান্ত রাখার জন্য পরামর্শ দিলেন, তুমি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম নববী রহ. (মৃতঃ ৬৭৬ হিঃ)-এর প্রসিদ্ধ এবং আগাগোড়া বরকতপূর্ণ কিতাব "রিয়াযুস্ সালেহীন"-এর উর্দূ অনুবাদ করে দাও। এ কিতাবখানা মরহুম ভাইজানের কাছে অনেক প্রিয় ছিল। তার আগ্রহ-চেষ্টায় একটি প্রথমবার নদওয়াতুল উলামার পাঠ্যভূক্ত করা হয়। আর আজ এটা

আরব দেশগুলোতে দ্বীনী এবং দাওয়াতী মজলিসগুলোর বিরাট গ্রহণযোগ্য কিতাব। তখন পর্যন্ত উর্দুতে এর কোনও অনুবাদ প্রকাশ হয় নি। কিন্তু কাজটা তত সহজ ছিল না। মূল কিতাবখানা মাঝারি কলেবরে হালকা মিসরীয় টাইপে সাড়ে চার শ'র অধিক পৃষ্ঠায় রচিত। এতে হাদীস সংখ্যা এক হাজার নয় শত তিন (১৯০৩) টি। এতে ছিহাহ গ্রন্থে সেসব হাদীসও সন্নিবেশিত আছে, যার ব্যখ্যায় বড় বড় জটিল বহু স্থান আসে। আর তার ব্যাখ্যায় উচ্চ পর্যায়ের উলামায়ে কিরাম ডজন ডজন এবং বিশের অধিক পৃষ্ঠা কালো করেছেন কলমের কালিতে। তিনি যথারীতি হাদীসের (কোনও মাদরাসা, বিদ্যাপীঠ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা কি বলব?) কোনও উস্তাদের কাছেও হাসীস পড়েন নি। আর পারিবারিক ও ঘরোয়া শিক্ষা-অধ্যয়নে এবং মাদরাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাঝে বিরাট পার্থক্য হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে অনেক বড় সাহস দিয়েছেন। তিনি "যাদে সফর" (বা পথের কড়ি) নামে সংশ্লিষ্ট শিরোনাম ও ব্যাখ্যামূলক জ্ঞাতব্যসহ এর অনুবাদ সম্পন্ন করে ফেলেন। এ অনুবাদ যার চতুর্থ সংস্করণ পাঠকের সম্মুখে– এটা দু'খণ্ড এবং আট শ'র অধিক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। আজ চিন্তা করলে একে একটি কারামত বলেই মনে হয়। জানি না, এটা আমাদের মুখলেছ একনিষ্ঠ ভাইয়ের কারামত ছিল নাকি সেই বোনের ব্যথাতুর চুরচুর ভগ্নপ্রাণের– যার সম্পর্কে বারী তা'আলার ঘোষণা রয়েছে– انا عند المنكسرة قلوبهم (আমি ভগ্নপ্রাণের খুব কাছে থাকি)। মোটকথা, আজ যখন হাদীসের বিশাল কিতাবের প্রতি লক্ষ্য করি, যা ইনশাআল্লাহ তার এই আধ্যাত্মিক সফরে "আলোময় তরী" এর কাজ করেছে বলেই মনে হয়, তখন জলিল মাঙ্গপুরীর নিম্নোক্ত পঙক্তিটি অজান্তে অনিচ্ছায়ই মনে পড়ে যায়–

مل گیا زاد سفر مجھ کو سفر سے پہلے

"পেয়ে গেলাম আমি পথের কড়ি সফরের আগেই"।

মাওলানা শাহ হাকীম আতা সাহেব এ পাণ্ডুলিপির উপর পুনঃদৃষ্টি ও উপকারী পরামর্শ দেন। তার আরও সৌভাগ্য ছিল যে, বিশিষ্ট আলেম সমকালের গবেষক মাওলানা সুলাইমান নদবী রহ. স্বস্নেহে ও অনুগ্রহপূর্বক (১৫ শা'বান ১৩২৫ হিঃ) এর উপর একটি ভূমিকা লিখে দেন। তিনি তার ভূমিকায় লিখেন– আমি অতিব আনন্দের সাথে বলছি, ইমাম নববী রহ. "রিয়াযুস সালেহীন" কিতাবখানার অনুবাদ এমন ঘরের লোক করেছেন, যে ঘর সুন্নাতের নববীর প্রচার-প্রসার এবং বিদ'আত-কুসংস্কার নির্মূলের কাজ এক শতক পূর্ব থেকে শুরু করে ছিল। যাদের জ্যোতির্ময় আলো-আভা, নূর ও

বরকতসমূহ দেশের সর্বত্র উজ্জ্বল দ্বীপ্তিমান। اللهم زد فزد ولا تنقص (হে আল্লাহ তুমি আরও অনেক অনেক উন্নতি দাও; কমিও না)।

আরেকটু সামনে গিয়ে লিখেন– উক্ত অনুবাদিকা তার অনুবাদে ভাষার সাবলীলতা প্রাঞ্জলতার ও গতিশীলতার লক্ষ্য রেখেছেন। স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী সংযোজন করেছেন। প্রতিটি হাদীসের শিরোনাম দিয়েছেন। যার দ্বারা মর্মকথা বা অন্তর্মর্ম পর্যন্ত পৌঁছুতে কিতাবের পাঠকদের বিরাট সহজ হয়।"

কিতাবখানার অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতার একটি প্রমাণ তো সে সব অসংখ্য শোকপত্র থেকে পাওয়া যায়, যেগুলো তাঁর মৃত্যুর পরে হস্তগত হয়েছে। যেগুলোর লেখকগণ ঐ কিতাব সম্পর্কে গভীর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এবং উপকারীতা লাভের কথা উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়ত খুব সম্ভব তিনিই প্রথম ভারতীয় নারী, যার রচনা জিদ্দাস্থ সউদী বেতার কেন্দ্র থেকে কিস্তি কিস্তি উর্দূ প্রোগ্রামে সম্প্রচারিত হয়েছে। আর রাবেতা আলমে ইসলামী তো এর কয়েক শ' কপি ক্রয় করে উর্দূভাষী দেশগুলোতে প্রেরণ ও বিতরণ করেছে। সুতরাং কবি যওকের নিচের পঙক্তিটি যেন পুরোপুরি তার অবস্থামাফিক, تری آواز مکے اور مدینے (তোমার ডাক মক্কা-মদীনায়।)

এ কিতাবখানার প্রকাশ্য বরকত দেখা গেছে, এ অনুবাদকর্ম সম্পন্ন করার পরপরই আল্লাহ তা'আলা তাকে হজ্জে গমনের সৌভাগ্য দান করেছেন। তাকে পৌঁছে দিয়েছেন দরবারে রেসালাতে, যার কথা ও বাণীর করেছেন তিনি নিজের সাধ্যমত। এ সফরের ঘটনাও আশ্চর্য প্রভাবময় ও শিক্ষণীয়।

সম্ভবত ১৯৪৭ খ্রিঃ এপ্রিল মাসের কথা। আমাকে তাবলীগ জামাতের তৎকালীন আমীর মাওলানা মুহাম্মদ ইফসুফ কান্ধেলবী রহ. হেজাযের উদ্দেশ্যে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ ও পোশাক পরার নির্দেশ দিলেন। আর সিদ্ধান্ত করলেন, আমি যেন কিছুদিন সেখানে অবস্থান করি। যেন এই দাওয়াতী কাজের উন্নতি সাধন এবং শিক্ষিত মহলে একে পরিচিত করার প্রয়াস চালাই। যার সূচনা কয়েক বছর পূর্বেই করা হয়েছিল। তিনি না কেবল এ নির্দেশই দিলেন বরং পথের কড়ি ও সফরের ব্যবস্থাও করে দিলেন। আমাদের শিরোমনি মাখদূম এবং যারপরনাই স্নেহশীল বুযুর্গ হযরত শাইখুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া সাহেব রহ.– যার বিশেষ স্নেহদৃষ্টি প্রথম থেকেই আমি অধমের প্রতি ছিল তিনি হুকুম করলেন, মুহতারাম আম্মাজান, সহধর্মীনি এবং স্নেহের ভাগ্নে মৌলভী মুহাম্মদ ছানীকে সঙ্গে নিয়ে নিবে। যাতে স্থির

মনে সেখানে দাওয়াতের কাজে লিপ্ত থাকতে পার। সে মুহূর্তের কথা আমি কখনও ভুলব না, যখন সেই মরহুমা সহোদরা বোন, যিনি বেশ কয়েকদিন ধরে এ সফরের কথা শুনে আসছিলেন, তিনি অকস্মাৎ আমার কামরায় প্রবেশ করলেন এবং বড় অধিরতা ও ব্যাকুলতার সঙ্গে কেঁদে কেঁদে বললেন– আলী! তোমারা কি আমাকে এখানেই ফেলে যাবে? তাঁর কথা শুনে স্বয়ং আমারই কান্না থামানো মুশকিল হচ্ছিল। কেননা তার জীবনরে সকল ঘটনা আমার সম্মুখে ছিল। আমি বললাম, না। আমি অঙ্গিকার করছি, আপনাকে ছাড়া যাব না। নতুবা কেউ যাবে না। একথা শুনে তিনি নিশ্চুপ চলে গেলেন।

আমি কথা বলতে তো সেকথা বলে দিলাম। কিন্তু মুশকিল ছিল, তখন মাত্র এক বছর হয়েছিল যুদ্ধ শেষ হয়েছে এবং হিজাযের পথ খুলেছে। সফরের জন্য মুসাফিরদের কোটা ছিল নির্ধারিত। দরখাস্ত দিতে হত। তারপর পারমিট (অনুমতিপত্র) আসত। আর সেসব লোকই যেতে পারত, যাদের হজ্ব কমিশনের পক্ষ থেকে পারমিট হাতে এসেছে। আমাদের তিনজনের পারমিট এসে গিয়েছিল। কিন্তু স্নেহের মৌলভী মুহাম্মদ ছানী এবং আমার সহোদরা বোনের জন্য তখন পর্যন্ত কোনও দরখাস্তই দেওয়া হয় নি। আর সময় পেরিয়ে যাওয়ার কারণে তাদের জন্য পারমিট তিতে অস্বীকৃতি জানানোর আশঙ্কাই ছিল বেশি। ভাগ্যক্রমে আমি নিজেই দিল্লি গেলাম। সেসময় ভারত সরকারের হজ্ব অফিসার ছিলেন লাল শাহ্। আমি তার সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। তিনি বললেন– কোটায় এখন আর কোনও সুযোগ নেই। আমি হতাশ হয়ে ফিরছিলাম। তিনি আমাকে আবার ডাকলেন, বললেন, মাওলানা! সুযোগ তো নেই, তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে বলছি– আপনি বন্দরে পৌঁছে গেলে সুযোগ বেরিয়ে আসবে ঠিকই। প্রাণে প্রাণ ফিরে এল। আমি লক্ষ্ণৌ এসে বোনকে এই সুসংবাদ শোনালাম, এখন প্রয়োজন আপনার দু'আ। করাচি পর্যন্ত তো আমরা সবাই একসঙ্গে যাব। তার সম্মুখে আপনার দু'আ এবং আল্লাহর রহমত।

তিনি এই সংশয়পূর্ণ অবস্থায়ও যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে গেলেন। সেদিন যেন তার ঈদের দিন হয়ে গেল। অনেক বছর তিনি সানন্দে রায়বেরলী গেলেন আপন বোনের সঙ্গে সফরের মুহূর্ত এসে গেল।

২৬ জুন ১৯৪৭ খ্রিঃ (শা'বান ১৩৬৬ হিঃ) একই ঘরের পাঁচ সদস্যের এই ছোট্ট কাফেলাটি পাঞ্জাব বন্দর থেকে যাত্রা করল। পূর্ণ পথই অতিক্রম হল আশা-ভরসায়। পথিমধ্যে মহিলা বগিতে অবস্থানরত সহোদরা বোনটি মরহুমা আম্মাজানের জ্বালাময়ী মোনাজাতগুলো পড়ে শোনাতেন। যাতে মহান আল্লাহর

অপার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছিল। লাহোরের পথে আমরা করাচি পৌঁছি। বোম্বাই আমাদের থেকে কাছে ছিল। কিন্তু তখন পর্যন্ত সেখানে কারও সঙ্গে পরিচয় ছিল না। করাচিকে বেছে নেওয়া হয়েছে হাজী আব্দুল জাব্বার সাহেবের কারণে। যিনি ছিলেন দিল্লির পাঞ্জাব বংশোদ্ভুত। করাচির বিখ্যাত ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং তাবলীগ জামাতের ঐ অঞ্চলের প্রথম মুবাল্লিগ ও সক্রিয় সাথী। তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল নিযামুদ্দীনে, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ রহ. এর জীবদ্দশায় ও দয়ার্দ্রতার ছায়ায়। আমরা করাচি পৌঁছেছি অকস্মাৎ। এখন স্মরণ নেই, হাজী সাহেবকে আগে ফোন দেওয়া হয় নি কেন? রাতটা আমরা যেন-তেনভাবেই কাটালাম। তারপর আমি হাজী সাহেবের খেদমতে গিয়ে হাজির হলাম এবং ভয়ে ভয়ে বললাম, আমাদের সঙ্গে দু'জন অভিযাত্রী পারমিট ছাড়া আছেন (আল্লাহ পাক তাদের কবরকে আলোয় আলোয় ভরে দিন)। হাজী সাহেব শোনামাত্র বললেন– আপনি কোনও চিন্তা করবেন না, সকলেরই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তখনই তাঁর পুত্রকে হুকুম করলেন, গাড়ি নিয়ে যাও! সবাইকে নিয়ে এসো এবং ভাইজান (হাজী আব্দুস সাত্তার)-এর ওখানে থাকতে দাও। তখনই এ কাফেলা হাসি-খুশি পৌঁছে গেল আব্দুস সাত্তার সাহেবের কুঠিতে। তার কুঠির কয়েক রুমবিশিষ্ট উপরতলাটি আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। আল্লাহ তা'আলা ঐ দু'ভাইয়ের মর্যাদা বাড়িয়ে দিন। দান করুন অনন্ত সুখ-শান্তি। কেননা ঐ হাজী আব্দুল জাব্বার সাহেব আমাদের মনোরঞ্জন ও সহানুভূতি প্রদর্শন এবং হাজী আব্দুস সাত্তার ও তার পরিবার সেবা-যত্ন ও আতিথিয়েতায় এতটুকুও ক্লান্তিবোধ করেন নি। আমাদের টিকিট ছিল উলাবী জাহাজের– যা ছোটও ছিল আবার এর তারিখও ছিল সন্নিকটে। এদিকে মরহুমা বোন নারীদের বেশ কিছু তাবলীগী জলসায় তার কোনও দ্বীনী (ধর্মীয়) রচনা কিংবা "যাদে সফর" এর কোনও অংশ পড়ে শুনিয়েছেন। অপরদিকে আমিও তাবলীগী ময়দানে এখন থেকে বেশি দীপ্তিমান ছিলাম। কাজেই হাজী আব্দুল জাব্বার সাহেব মরহম একটি সুবিজ্ঞ পরামর্শ দিলেন। যার রহস্য পরবর্তীতে বুঝা গেছে। তিনি পরামর্শ দিলেন, আপনারা উলাবী জাহাজের পরিবর্তে ইসলামী জাহাজে সফর করুন। এ জাহাজটি যেমনি বড়; তেমনি আরামদায়ক। তা ছাড়া এটা বন্দর ছেড়ে যাওযার পূর্বে সপ্তাহ দশদিন বাড়তি উপকার লাভের সুযোগও হবে আমাদের। তার পীড়াপীড়ি আর সে সময় করাচিতে অবস্থানরত এবং তাবলীগ জামাতের প্রথম সারীর আরেক সক্রিয় সাথী মুহাম্মদ শফী সাহেব কুরাইশী রহ. এর তাগিদে তার পরামর্শ মেনে নেওয়া হয়। অনন্তর দেখা গেল, যারা উলাবী জাহাজে সফর করেছিল,

তাদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। পৌঁছাতেও হয়েছে অনেক বিলম্বে। পক্ষান্তরে ইসলামী জাহাজে সফর করার পেছনে অনেক অনেক রহস্য ছিল, যা সামনে উল্লেখ করা হচ্ছে।

ইসলামিক জাহাজে আমরা প্রথম শ্রেণীর যে কেবিনটি পেয়েছি, তার পাশের দুটি কেবিন ছিল বোম্বাই থেকে আগত এক বিরাট বিশিষ্ট নন্দিত ব্যবসায়ী হাজী আহমদ এবং তার বংশের লোকজন। এখানেও সেই অবস্থার সৃষ্টি হয়, যা হয়েছিল করাচিতে। জাহাজ জুড়ে ছিল তাবলীগী ও দাওয়াতী পরিবেশ। মহিলাদের পৃথক জলসা হত। সেখানে কোনও একভাবে মুসাফির মহিলারা জানতে পারল যে, বোনটি একজন লেখিকা ও বিদ্বান-গবেষক। দ্বীনিয়াত ও ধর্মীয় জ্ঞান-প্রজ্ঞায় সুদক্ষ। ব্যাস আর যায় কোথায়! এক-দুটি রচনা শোনার পরে এ নারীগণ তার ভক্ত-অনুরক্ত হয়ে গেল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনুরাগ ও সম্পর্ক হয়েছে হাজী আহমদ সাহেবের বংশের, বিশেষত তাদের "খোশদামন" সাহেবার। তিনি তো একেবারে মাতৃসূলভ আচরণ করতে থাকেন। বোনটির মন ছিল এমনিতেই দুর্বল আর বিভিন্ন দুঃখ-ব্যথা ও শোকতাপ তাকে করে দিয়েছিল আরও দুর্বল। ঝড় বইছিল সমুদ্রে আর জাহাজে অস্বাভাবিক নড়াচড়া ও হৈচৈ। তার ভয় হতে লাগল। ছড়িয়ে পড়ল ত্রাস। এহেন মুহূর্তে এই পুণ্যবান ধার্মিক নারী রহমতের দূত হয়ে সম্মুখে আসেন। তিনি তাকে (বোনটিকে) সব ধরনের সান্ত্বনা দিতেন। নিজের কেবিনে নিয়ে যেতেন। খাতির-যত্ন করতেন বেশ। তার বিচ্ছিন্নতা পছন্দ ছিল না। তার মধ্যে শ্রদ্ধা-স্নেহ দুটিই ছিল সমান। এ সম্পর্ক এমনই বরকতময়, উপকারী ও স্থায়ী-সুদৃঢ় প্রমাণিত হয়েছে, যার ফলে হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এবং এ মরহুমার জীবনের শেষদিন করাচিতে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত তিনি কখনও তার পত্রাবলী ও হাদিয়া উপহার প্রেরণ বন্ধ করেন নি। মরহুমা বোন ঐ বংশ-পরিবারের সম্মান ও মহব্বতের কথা যখনই স্মরণ করতেন, তখন তার প্রতিটি অভিব্যক্তিতে কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটত। তার মনপ্রাণ অফুরন্তভাবে তাদের জন্য দু'আ করত। বন্দরে পৌঁছতেও তিনি বিরাট সাহায্য করেছেন। হারামাইন শরীফাইনে গিয়েও তিনি আসা-যাওয়া করতেন যথারীতি। নিয়ে যেতেন সঙ্গে করে। আমাদের প্রত্যাবর্তনের মুহূর্তে বোম্বাইতে একরকম জোর করে এই মহিলা কাফেলাকে তিনি নিজ বাড়িতে অবস্থান করান। আমার সে বোনটিই নয় বরং যেসব মেয়েদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল, তাদের সঙ্গেও তিনি এ স্নেহ-প্রীতি প্রকাশ করতেন। বোম্বাই থাকতেই মুহাম্মদ ছানীর ওখানে প্রথম সন্তান জন্মের সংবাদ পেলাম।

তখন তিনি এ নবজাতকের জন্য– যিনি স্বয়ং এখন মাশাআল্লাহ দুই সন্তানের জননী (উমামা হাসানী)– কাপড়-চোপড় ও খেলনাপাতি পাঠালেন। মরহুমা আম্মাজানের বরকতে কিংবা মরহুমা বোনটির উপর আল্লাহর রহমতে এ সফরে পদে পদে আল্লাহর মদদ ও সাহায্য প্রত্যক্ষ করেছি খোলা চোখে।

হজ্বে বিশেষত আরাফার ময়দানে বিরাট মনোযোগিতা, ব্যস্ততা এবং দু'আ-মুনাজাতের মধ্যে সময় কেটেছে। তার অবস্থা ছিল আরাফার ময়দানে পঠিত মাসনূন দু'আর প্রতিচ্ছবি।

أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق

"আমি দীন-দুঃখী, মুখাপেক্ষী-অভাবী, ফরিয়াদী-প্রার্থনাকারী, আশ্রয়প্রার্থী, কম্পমান ভীত-সন্ত্রস্ত।"

হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তার সবচেয়ে যত্নের-গুরুত্বের ও প্রিয় ব্যস্ততা ছিল মুহতারামা আম্মাজানের সেবা-শুশ্রূষা এবং তার সাহায্য সহযোগিতা। যিনি দিন দিন দুর্বল রুগ্ন অক্ষম হয়ে যাচ্ছিলেন। আর জীবনের শেষ বছরগুলোতে তার দৃষ্টিশক্তি একেবারেই হারিয়ে যাচ্ছিল। একাজ যেমন ছিল মুশকিল, তেমনি স্পর্শকাতর। সার্বক্ষণিক দায়িত্ব, দুর্বলতা ও অক্ষমতার চাহিদা ও প্রয়োজনাদি আবার তার উপর মায়ের ব্যাপার। এটা একান্তই তার সৌভাগ্য ও সাহসিকতা ছিল। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বভার অতি উত্তমরূপে সামলে যান। আর فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما আয়াতে কারীমার উপর এমনভাবে আমল করেন, যার ফলে তিনি (আম্মাজান) এ নশ্বর পৃথিবী থেকে বড় আনন্দিত ও প্রশান্ত মনে এবং তার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনাকারী হয়ে বিদায় নেন। এটা দু'এক বছরের বিষয় ছিল না। অবশ্যই প্রায় দশ বছর কেটেছে এই ধারাবাহিক ও ধৈর্য পরীক্ষার সেবা-শুশ্রূষায়। এটা তার জীবনের এক চমকপ্রদ অধ্যায়। আর পরকালীন জীবনের এক অমূল্য সঞ্চয়। আম্মাজানের ইন্তিকালের বিষয়ে প্রকাশিত "রিযওয়ান' পত্রিকার এক বিশেষ সংখ্যায়" তার যে রচনা ছাপা হয়েছে, তাতে সেকালের কিছু তথ্যচমক দৃষ্টিগোচর হয়।

১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ রহ. আমাদের দীনঘর রায়বেরলী তাশরীফ নিয়েছিলেন। তখন তিনি আম্মাজান, বংশের অন্যান্য নারী ও বোনদের সঙ্গে তার হাতে বাইআত এবং তাওবা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তার ইন্তিকালের পর হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর হাতে নতুনভাবে বাইআত হন। (বাইয়াত নবায়ন করেন।) আর জীবনের শেষ মুহূর্ত

পর্যন্ত তার প্রতি মহব্বত ও শ্রদ্ধানুরাগ ছিল। চিঠিপত্র লেখারও মুহূর্ত এসেছে। তিনি একবার হযরত মাওলানার বরাবরে এক ভারী ব্যথা-ভারাক্রান্ত ও প্রাণস্পর্শী পত্র লিখেছিলেন। দরখাস্ত করেছিলেন দু'আ ও অন্তর্দৃষ্টি দানের। মাওলানা এর জবাব অসাধারণ স্নেহ ও নেহাৎ গুরুত্বের সাথে দিয়েছিলেন দেখেছি। পত্রখানার শব্দে শব্দে তার গভীর প্রভাব এবং বুযুর্গসুলভ স্নেহ-প্রীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। তাতে তিনি তাকে গভীর সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। প্রকাশ করেছিলেন সমবেদনা। আমাদের বড় বোনসহ ঘরে আরও বেশ কয়েকজন সদস্য হযরত শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া রহ. সাথে বাইয়াত ও তরবিয়তের সম্পর্ক রাখতেন। হযরত শাইখের প্রতি মরহুমা বোনটির বিশেষ প্রদ্ধানুরাগ ছিল। একবার তো তিনি খাদেমা (সেবিকা) সুলভ অনুযোগ করলেন, তিনি শুধু বড় বোনকে (যনি নিয়মিত চিঠিপত্র লিখতেন হযরতকে) সালাম লিখেন এবং দু'আ দেন। হযরত শায়খ এরপর থেকে আবশ্যক করে নিয়েছিলেন, প্রত্যেক চিঠিতে তাকেও অবশ্যই সালাম লিখবেন এবং দু'আয় শরীক রাখবেন। মরহুমা এ বোন সে সময় একাধিক ধর্মীয় বই-পুস্তক ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন। আল্লাহ পাক যখন আমাকে আরবী ভাষায় শিশুদের উপযোগী করে মাদরাসার প্রাথমিক পাঠ্যবই হিসেবে তিন খণ্ডে রাসূলে কারীম সা. কিস্‌সা লেখার তাওফীক দিলেন, যা "কাসাসুল্ নাবিয়্যীন" নামে প্রকাশিত, তখন তিনি এর খোলা তরজমা করেছেন। যা স্বতন্ত্র একটি রচনার মর্যাদার রাখে এবং "শিশুদের কাসাসুন্ নাবিয়্যীন" নামে প্রকাশিত ও সমাদৃত হয়েছে। ভাইয়ের তো সে সময় তিন খণ্ড মাত্র লেখার তাওফীক হয়েছিল। কিন্তু উক্ত সাহসী বোন এর চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড লিখে এ ক্রমধারা সম্পন্ন করেন। চতুর্থ খণ্ডে হযরত শু'আইব আ., হযরত আইয়ূব আ., হযতে দাউদ ও সুলাইমান আ. প্রমুখ নবী-রাসূলগণের ঘটনা রয়েছে। আর পঞ্চম খণ্ড সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সা. জীবন চরিত প্রসঙ্গে লিখিত। যা "আমাদের নবী সা." নামে প্রকাশিত ও সাদর সমাদৃত হয়েছে।

আমাদের বংশে একটি প্রার্থনামূলক কবিতা বিরাট সমাদৃত ও প্রচলিত আছে। দুঃখ-দুর্দশা, পেরেশানী এবং অধিকাংশ ওযীফা হিসেবে ভারী সুর-সঙ্গীত ও মর্মস্পর্শীতার সাথে এটা পাঠ করা হয়। এটা বংশের নারী ও কন্যাদের মুখস্থ আছে। এটা কোনও এক অজানা তবে নন্দিত কবির লিখিত কবিতা। যার ছদ্মনাম ছিল হাতেফ। উক্ত কবিতায় মহান আল্লাহর আসমায়ে হুসনার মধ্য থেকে এক একটি নাম নিয়ে তার কাছে দু'আ করা হয়েছে। এটা প্রসিদ্ধ ছিল

"নাতে উযমা" (মাহাত্ম্যের গান) নামে। মরহুমা বোনের এর প্রতি ছিল বিশেষ আকর্ষণ, পাঠে ছিল বিরাট পারদর্শিতা। তিনি একে "মুনাজাতে হাতেফ" নামে প্রকাশ করেছেন। এ কিতাবের প্রকাশনাও তার একটি সুকীর্তি।

সেকালে আরও একটি কাজ ছিল, সেসব মোনাজাত এবং কবিতাগুলোর অনুলিপি তৈরী করা, যেগুলো মরহুমা আম্মাজান রচনা ও আবৃত্তি করতেন; তিনি স্বয়ং লিখতে পারতেন না। এজন্য অন্য কাউকে দিয়ে লেখাতেন। এ কাজটি বেশিরভাগ তাঁকেই করতে হত। সেইসঙ্গে তিনি নিজের বড় বোনের গৃহস্থলীর কাজকর্ম-ব্যবস্থাপন– যা মাশাআল্লাহ এক বড় ও প্রাণচঞ্চল ঘর– এর দায়িত্বভারও স্বেচ্ছায় নিজ কাঁধে তুলে নেন এবং তাকে প্রায় এ চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত করে দেন। নিজের মন ভুলানো এবং খেদমত করা আর সেবা-শুশ্রূষার আগ্রহে তিনি নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও রাখতে শুরু করেন। এভাবে ব্যবসার একটি সুন্নাত পালনও হয়ে যায়। একারণে অনেক সময়ই তাকে দুর্ভোগ পোহাতে হত। বেশির ভাগ এসব জিনিস বাকীতে বা ঋণ হিসেবে যেত। তার বড় বড় অংকের টাকা-পয়সা চলে যেত মানুষের হাতে। বেশ কয়েকবার তাকে বলা হয়েছে, কেন সে এই টানাপোড়েন ও মাথা ব্যথা কিনে রাখে? তিনি এর জবাবে বলতেন, আমি এসব জিনিসপত্র না রাখলে মানুষের কষ্ট-ভোগান্তি হয়ে যাবে। এর দ্বারা সময়-অসময় মানুষের কাজ হয়ে যায়। পূর্ণ হয়ে যায় প্রিয়জনদের প্রয়োজনাদি। বলাবাহুল্য, আমাদের বাড়ি শহর থেকে দূরে। কাছে ধারে কোনও বাজারও নেই।

ডিসেম্বও ১৯৫৬ খ্রিঃ থেকে স্নেহের মাওলানা মুহাম্মদ ছানী এবং তার তত্ত্বাবধানে মুসলমান স্ত্রী, কন্যা, বোন ও মাহিলাদের ধর্মীয় পুস্তিকা "রিযওয়ান" প্রকাশ শুরু হয়। এতে তার লেখাপড়ার আরেকটি কর্ম হাতে আসে। এতে তিনি সমানভাবে প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখতেন। তার বিভিন্ন কবিতাও ছাপা হত এতে। এই ধারাবাহিকতা তার মৃত্যু অবধি চালু থাকে।

এগুলো তার জীবনগ্রন্থেও জরুরী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ও শিরোনাম। যেগুলো জীবনী রচনার জন্য আবশ্যকীয়। কিন্তু তার জীবন গ্রন্থের সর্বাধিক মূল্যবান পৃষ্ঠা এবং সবচেয়ে আলোকোজ্জ্বল শিরোনাম হল, তার মনোত্তাপ, অন্তর্জ্বালা, দু'আর আগ্রহ, তার মনের ব্যাকুলতা, তার চক্ষুদ্বয়ের অশ্রুপাত এবং তার অহর্নিশ আহাজারী। বাহ্যত যা তার বিশেষ অবস্থা-প্রেক্ষিতের ফল। কিন্তু বাস্তবে তার দাসত্ব প্রকাশের জন্য অদৃশ্য সম্পদ; তার উন্নতি ও মর্যাদা বৃদ্ধির উপকরণ। বড় শুভ সেই ভূমিকাগুলো, যা এমন পরিণতি সৃষ্টি

করে। আরও শুভ সেসব অবস্থা-পরিস্থিতি, যা এভাবে (কাউকে তার) মালিকের সামনে কাঁদায়; প্রবাহিত করে প্রেমাশ্রুর, যা দেখে-শুনে উদ্বেলিত হয় মহান আল্লাহর অজস্র রহমত। পাথর প্রাণেও পানি নির্গমন হয়। বিদায় হওয়ার পূর্বে একবার একটু এই কবিতা পড়ুন। কেমন প্রাণ থেকে নিঃসৃত এ কবিতা! আর রহমতের সাগরে কেমন তার যাদুক্রিয়া? আজও তা মনের স্থির সমুদ্রে যাদুময় তরঙ্গ সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট। পড়ুন এ কবিতা! পড়ুন বারবার! পড়ুন মনের গহীন থেকে!

کب سے کھڑی ہوں یارب امید کے سہارے
یہ دن نہ جانے میں کس طرح سے گزارے

بے چین و مضطرب دل جاکر کسے پکارے
وہ کون ہے جو حالت بگڑی ہوئی سنوارے

ہے باب یہ کرم کا خالی نہ پھر یارب
دنیا اگر تجھے ہے پھر کیوں ہی دیر یارب

کنج و قفس سے بدتر اپنا ہے آشیانہ
اس قید بے کسی میں گزرا ہے اک زمانہ

مغموم دل پہ یارب لازم ہے رحم کھانا
کرتی ہوں میں شکایت تجھ سے یہ عاجزانہ

بار الم ہے دل پر طاقت نہیں ہے دل میں
کیونکر ہو صبر مجھ سے ہمت نہیں دل میں

উক্ত কবিতার আরও দু'টি পংক্তি মনকে সামলে নিয়ে শুনুন। তিনি লিখেন–

کب سے لئے کھڑی ہوں میں کاسئہ گدائی
اب تک ملا نہ مجھ کو اور شام ہونے آئی

এটা দ্বিতীয় কবিতা। আর কে আছে এমন বড় থেকে বড় বিদ্বান-পণ্ডিৎ ও ব্যথিতপ্রাণ, যে এই কবিতা পড়ে দাসত্ব ও অক্ষমতার স্বাদ পাবে না।

بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے
میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے

এসব কবিতা তার সংকলিত "বাবে করম" থেকে চয়িত। যা ছাপা হয়ে দু'আ ও মুনাজাতে আগ্রহী নারী-পুরুষের মাঝে সাদর সমাদৃত হয়েছে।

অবশেষে একদিন সেই মুহূর্ত এসে পড়ে, যা নিশ্চয় আসবে সকল প্রাণীর জীবনে। তিনি যার দুয়ারে বছরের পর বছর কপাল ঠুকেছেন, দিয়েছেন সিজদা, করেছেন আহাজারী আর মুহতারামা আম্মাজানের ভাষায় সত্যিই বলতে হয়

عمر گزری ہے ترے دربار میں آتے ہوئے
گڑ گڑ اتے مانگتے اور ہاتھ پھیلاتے ہوئے

(কেটেছে জীবন দুয়ারে তোমার কপাল ঠুকে। কত কান্না-কাটি, যাচনা আর হাত পেতে।)

সুতরাং তার রহমতের ফায়সালা চূড়ান্ত হয়ে গেল। এবার তিনি তার এ বিনীত, ব্যথা ভারাক্রান্ত, ভগ্নপ্রাণ, মনোত্তাপে দগ্ধ বান্দিকে এই শ্রম সাধনার জগত থেকে আপন রহমতের ঐ প্রান্তরে ডাকলেন, যেখানে অবস্থানকারীদের জন্য তিনি ঘোষণা করেছেন–

لاخوف عليهم ولاهم يحزنون

(তাদের নেই কোনও ভয়; আর না তারা উদ্বিগ্ন-চিন্তিত হবে।)

রজব-শা'বান ১৩৯৫ হিজরী (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৭৫ খ্রিঃ) থেকে তার ভেতরে ভেতরে কিছু কষ্ট-যাতনা হতে থাকে। শেষ পর্যন্তই যা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি ঠিকভাবে। যে রমাযানুল মুবারকের (১৩৯৫ হিঃ/১৯৭৫ খ্রিঃ) জন্য বিরাট প্রতীক্ষা ছিল, এবার সে রমাযানে মাত্র দশটি রোযা রাখতে সক্ষম হোন তিনি। কেননা দুর্বলতা ও কাঁপুনির মারাত্মক আক্রমণ হয় তার ওপর। রায়বেরলীর জনৈক অভিজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসার মাধ্যমে সে অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল ঠিক, কিন্তু শক্তি-কর্মক্ষমতা আর ফিরে আসল না। চলাফেরা করতে পারতেন ঠিক কিন্তু দুর্বলতা বরাবরই বাড়ছিল। এদিকে আমরা নদওয়াতুল উলামার ৩১ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলন– ১৯৭৫খ্রি.-এর প্রস্তুতি কাজে এত ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, যদ্দরুন আমাদের স্বয়ং নিজের আপাদমস্তকের খেয়াল রইল না। কিন্তু যখন সম্মেলন থেকে অবসর হয়ে সম্ভবত ৭/৮ নভেম্বর রায়বেরলী এসে পৌঁছলাম, তখন ঘরে পা রাখতেই সর্বপ্রথম তিনিই নিজ কামরা থেকে বেরিয়ে দরজা পর্যন্ত আসলেন এবং বললেন– আলী! ধন্যবাদ! তোমাদের সম্মেলন বেশ সফল হয়েছে। আমাদের দুই বোন এবং ঘরের মেয়েরা, ছোট বড় সকলেই সম্মেলন সফল হওয়ার জন্য দিনরাত দু'আ করছিল। তাদের কেউ

লক্ষ্ণৌ যেতে পারে নি। কিন্তু আগন্তুক আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে তারা খবরাখবর নিতেন। তাদের সেই আনন্দ-উচ্ছাসের কথা আজও স্মরণ আছে। যা আমাদের লোকজনের মুখে সম্মেলনের অবস্থা শুনে তাদের হচ্ছিল।

সম্মেলন এবং জরুরী কাজকর্ম থেকে যখন আমরা অবসর হলাম, তখন তার ছোটরা পীড়াপীড়ি শুরু করল, লক্ষ্ণৌ নিয়ে গিয়ে ডাক্তারদের দেখান। সঠিক রোগ নির্ণয় হয়ে যাবে। এতে তার অনেক আপত্তি ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছোটদের পীড়াপীড়ি প্রাধান্য পায়। তিনি ১৭ জানুয়ারী ১৯৭৬ খ্রি. লক্ষ্ণৌ গমন করেন। যাওয়ার মুহূর্তে তিনি কোনও একজনকে বললেন– "জানি না, হয়তো মৃত্যুই আমাকে টেনে নিচ্ছে।" ইতোপূর্বেও তিনি এমন ইঙ্গিত করেছিলেন। আপন খালাত বোনের মেয়ে ফাতেমা –করাচির নবাব সাইয়িদ নূরুল হাসান খান সাহেবের নাতি নন্দিত কারী সাইয়িদ রশীদ হাসান-এর সহধর্মিনী– তার প্রতি এ বোনটির নিজ সন্তানের মতই স্নেহ-প্রীতি ছিল। তিনি তাকে মেয়ের মতোই রেখেছিলেন। এই সম্বন্ধও হয়েছিল তার পছন্দ ও চেষ্টায়। মেয়েটির মা জীবিত থাকা সত্ত্বেও তিনিই তাকে আপন মায়ের মতো বিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি নবাব সাহেবের সেই যুগ দেখেছিলেন। তার এবং তার সহধর্মিনীর স্নেহ-মহব্বত সব চোখের সামনে ছিল। তিনি আমাদেরকে নিজ সন্তানের মতোই মনে করতেন। এজন্য তার এ আত্মীয়তায় বিরাট আনন্দ ছিল। কয়েক বছর ধরে এই মেয়ে –আজ যে মাশাআল্লাহ একাধিক সন্তানের মা (আল্লাহ তাদের শান্তি ও নিরাপদে রাখুন)– রায়বেরেলী আসত না। তিনি এখান থেকেও তার ছেলেমেয়েদেরকে যথারীতি উপহার পাঠাতেন। কারী সাহেবের যখন চিঠি আসল– আমরা সবাই আসছি, তখন তিনি শোনা মাত্রই বললেন– এখন কি আর আমার সাথে সাক্ষাত হবে?

মরহুমা বোনটি যেদিন লক্ষ্ণৌ পৌঁছলেন, সেদিনই আমার নাগপুর, আওরঙ্গাবাদ এবং পৌনার দৌরপুর যাওয়ার কথা ছিল। আমি ১৭ জানুয়ারী সন্ধ্যায় দারুল উলূম থেকে ঘরে আসলাম। তাকে সালাম করব এবং দু'আ নিয়ে সফরে যাত্রা করব। তখন আকস্মিক বিপদ ও অস্থিরতার কোনও আলামত ছিল না। আমি দীর্ঘক্ষণ বসে বসে কথা বলতে থাকি। যে সময় তিনি আমাকে নিয়ম মাফিক বিদায় জানালেন এবং আম্মাজানের অভ্যাস অনুযায়ী إن الذى فرض عليك القران لرادك إلى معاد পড়ে আল্লাহর যিম্মায় ন্যস্ত করলেন– তখন কি জানা ছিল, সচেতন-সজ্ঞানে এটাই হবে তার সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাত।

সংক্ষেপে বলি, সফরের মাঝে আমার মধ্যে ফিরে আসার এমন তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হল, ফলে নিজের মানসিকতা ও অভ্যাস পরিপন্থী কারও পীড়াপীড়ি জয়ী হতে পারল না। সামনের সকল প্রোগ্রাম স্থগিত করে আওরঙ্গাবাদ থেকে বিমানে করে দিল্লি, দিল্লি থেকে ট্রেনে কানপুর আর কানপুর থেকে জিপে করে ২৫ জানুয়ারী বাদ মাগরিব লক্ষ্ণৌ এসে পৌঁছলাম। সঙ্গে ছিলেন আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ডা. মুহাম্মাদ ইশতিয়াক হুসাইন সাহেব কুরাইশী এবং স্নেহাস্পদ মৌলভী মঈনুল্লাহ নদবী (নায়েবে নাযেম নদওয়াতুল উলামা)। গাড়ী থেকে মাটিতে পা রাখতেই মনের মধ্যে বিদ্যুৎ গতিতে এ সংবাদ এসে পড়ল যে, তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞান। বেশ কয়েকজন রোগীর অবস্থা ইতোপূর্বে দেখেছি। আবার এক ডাক্তার পরিবারের সাথে সম্পর্ক আছে। এজন্য তার শেষ অবস্থা-চিত্র বিদ্যুতের মতো চোখের পাতায় ভেসে ওঠল। তারপর এ দুইদিন তিনরাত কিভাবে পার হল, তা বিশদভাবে শোনানোর অবকাশ নেই। এক কথায় জীবনের কঠিন দিনগুলোর মধ্যে সেগুলো অন্তর্ভূক্ত। মানুষের অসহায়ত্ব, জীবনের অনিশ্চয়তা, পৃথিবীর নশ্বরতা, আল্লাহর ইচ্ছার দৃঢ়তা-কঠোরতা ও রাজত্ব ক্ষমতা সবকিছুর বাস্ত বতা প্রতিভাত হয়ে গেল। অবশেষে ২৮ জানুয়ারী আনুমানিক সকাল দশ ঘটিকায় সেই ঘরে, যেখানে তিনি বাবা ও ভাইয়ের ছায়ায় শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য আর দুঃখ-সুখের অনেক দিন কাটিয়েছিলেন– এ প্রাণটা তার সৃষ্টিকর্তাকে সোপর্দ করে দেন। আর পুরোপুরি বাস্তব হয় জিগর মুরাদাবাদীর এ পঙক্তি :

عمر بھر کی بے قراری کو قرار آہی گیا

"সারা জীবনের অস্থিরতা সব আজ তো হলই স্থির।"

সেদিনই আল্লাহর এ আমানতকে, যে ছিল আমাদের সকলের অতিপ্রিয় –তার পৈত্রিক নিবাস থেকে আসল ও চিরস্থায়ী নিবাস পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়। إن إلى ربك الرجعى (নিশ্চয় তুমি ফিরে যাবে আপন প্রতিপালকের কাছে) সেদিনই (২৮ জানুয়ারী) আসর নামাযের পরে এক বিশাল জামাআতসহ –যেখানে উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য আলেম-উলামা, ছাত্র-শিক্ষক ও নেককার লোকজন– তার জানাযার নামায পড়া হয় এবং তার সেই স্নেহময়ী মায়ের পাশে মাটির বুকে সঁপে দেওয়া হল তাকে। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তিনি যার খেদমত করেছিলেন। একদিকে তার সুযোগ্য বিখ্যাত পিতা, অপরদিকে তার স্নেহশীল ও দয়ার্দ্র ভাই ডা. সাইয়িদ আব্দুল

আলী আর মাঝে হাসানী ও কুতবী বংশের দুই মহান বুযুর্গ হযরত শাহ আলামুল্লাহ নকশবন্দী এবং হযরত সাইয়িদ মুহাম্মদ আদল রহ. প্রমূখ বুযুর্গানে দীন আরামনিদ্রায় শায়িত আছেন। বর্ষিত হোক আল্লাহ পাকের অফুরন্ত রহমত সকলের ওপর। আর অসংখ্য দরূদ ও সালাম তার প্রিয় হাবীব, নবী-রাসূলগণের সরদার এবং পাপী-তাপীদের সুপারিশকারী মুহাম্মাদ সা. এর প্রতি, যার মাধ্যমেই নসীব হয় সিরাতে মুস্তাকীম, মুক্তির পথ এবং উচ্চ মর্যাদার ধন-রত্ন।

মুসলিম নারীদের সমীপে

ইসলামী সমাজ

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমি এই সম্মান প্রদর্শনের জন্য খুবই কৃতজ্ঞ যে, আপনারা আমাকে এই সভায় স্মরণ করেছেন এবং একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়ে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন। আমি এ কারণেও শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে, আপনারা আমার সৌজন্যে এই প্রোগ্রামে রদবদল ও সংশোধন মেনে নিয়েছেন। এটা আপনাদের ভদ্রতা ও সচ্চরিত্রতা। আমি কুরআনে কারীমের একটি আয়াত পাঠ করব এবং বলব– ইসলাম সমাজকে কি দৃষ্টিতে দেখে? তার মূল্যায়ন ও চিন্তাধারা কি? আর তা এ ব্যাপারে কতটুককু বাস্তবধর্মী প্রমাণ হয়েছে।

এ আয়াতে কারীমাটি সূরা নিসার। এ সূরার নামটিই প্রমাণ করে যে, ইসলাম নারী সমাজ এবং দুর্বল জাতিকে কি মর্যাদা দিয়েছে। সূরা নিসার প্রথম আয়াত–

يايها الناس اتقوا ربكم---------------- ان الله كان عليكم رقيبا

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর। যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা করে থাক এবং আত্মীয়-জ্ঞাতীদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। (সূরা নিসা– ১)

আমি মনে করি, নারীসমাজ সম্পর্কে ইসলামের ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য ও সম্পর্কের রূপরেখা প্রসঙ্গে উল্লেখিত আয়াতে কারীমা পুরোপুরি দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। প্রথমত আল্লাহ তা'আলা এতে ইরশাদ করেছেন– এই দুই শ্রেণীর সৃষ্টি একইভাবে হয়েছে। তাদের ভাগ্য পরস্পরের সাথে এমনভাবে জড়িত, যেন একই দেহের দুটি অঙ্গ। পুরুষ ও নারীর শারীরিক গঠন আকৃতিতে যৎসামান্য পার্থক্যের কারণ হল, যাতে তারা সুখ-সাচ্ছন্দ্যে জীবন সফর অতিক্রম করতে পারে।

প্রথমে তো এই দুই শ্রেণীর অস্তিত্ব এক সত্তা থেকে হয়েছে। তারপর ওই এক সত্তাকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এই বিভাজন সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কোনও বিরোধ, কোনও বৈরিতা নেই বরং তারা শেষে গিয়ে একই কেন্দ্রে

এক হয়ে যায়। এ পৃথিবীতে সফররত মানুষকে সফরসঙ্গী ও সহযাত্রী দেওয়া হয়েছে তার জাতি থেকে আর সে তারই দেহের অংশ। অনন্তর তাদের দু'জন থেকে মানবগোষ্ঠীর প্রসার ও বিস্তার ঘটেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'জনের বন্ধুত্ব, প্রেম-ভালবাসা ও সহযাত্রায় প্রভূত কল্যাণ ও বরকত দান করেছেন। কাজেই তাদের দু'জন থেকে হাজার জন হয়েছে আর হাজার জন থেকে লাখ-লাখ, কোটি কোটি হয়েছে। এমনকি জনসংখ্যার সঠিক পরিসংখ্যান কম্পিউটারও দিতে পারবে না, কতজন মানুষ জন্ম নিয়েছে। তা কেবলই আল্লাহ জানেন। كَثِيرًا (অনেক) শব্দ এনে আল্লাহ পাক তাদের সংখ্যাধিক্যের প্রতি ইঙ্গিগত করেছেন।

সেই নিবেদক; সেই নিবেদনপ্রাপ্ত

এবার আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– "তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অন্যের কাছে যাঞ্চা কর।" কুরআনে কারীমে বৈপ্লবিকভাবে এই ধারণা প্রথমবার পেশ করা হয়েছে যে, মানব সমাজের প্রতিটি সদস্য একে অন্যের মুখাপেক্ষী। প্রত্যেকেই প্রার্থনাকারী ও আবেদনকারী আবার প্রত্যেকেই আবেদনপ্রাপ্ত অর্থাৎ প্রত্যেকেই অন্যের কাছে কিছু না কিছু চায় আবার তার কাছেও কেউ না কেউ চায়। তারপর এভাবে বিভাজন করা হয় নি, যাতে একদিকে আবেদনকারীগণ আর অপরদিকে আবেদনপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ থাকে বরং যে আবেদনকারী সেই আবার আবেদনপ্রাপ্ত; যে কিছু চাইল; তার কাছেই আবার চাওয়া হচ্ছে। আবার কখনও এর উল্টো। تساؤل (পারস্পরিক প্রশ্নোত্তর) এমন একটি শিকল, যাতে প্রত্যেকেই আবদ্ধ। আমাদের সভ্য জীবন একটি জাল। যেখানে প্রত্যেকেই অপরের মুখাপেক্ষী।

পুরুষ নারীকে ছাড়া তার আল্লাহ প্রদত্ত ও স্বাভাবধর্মী সফর সুখকর ও মধুময় পন্থায় অতিক্রম করতে পারে না। আবার কোনো ভদ্র সম্ভ্রান্ত নারী জীবনসঙ্গী ছাড়া সুখীভাবে জীবন যাপন করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেককে অপরের এমন মুখাপেক্ষী ও প্রত্যাশী বানিয়ে দিয়েছেন, যদ্দরুন তাকে ছাড়া জীবন চলতে পারে না।

আল্লাহর নাম পরকে করে আপন

তারপর আরও বলা হয়েছে, যার নামে তোমরা পরস্পর যাঞ্চা কর, তিনি আল্লাহ। ইসলামী সমাজ অস্তিত্ব লাভ করে আল্লাহতে বিশ্বাস, আল্লাহর বড়ত্ব ও সম্মান, আল্লাহর কুদরত ও শক্তি এবং আল্লাহর একত্বের (তথা একত্ববাদের) বিশ্বাসের ওপর। একজন মুসলমান পুরুষের মুসলমান নারীর সাথে সহযাত্রা,

সহাবস্থান এবং বন্ধুত্ব ও প্রেম ভালবাসা তখনই বৈধ হয়, যখন তারা মাঝখানে আল্লাহর নাম নিয়ে আসে। আল্লাহর নামই পরকে আপন বানিয়ে দেয়, দূরকে নিকটে করে দেয়। অপরিচিতকে করে পরিচিত। যাদের শরীরের ছায়া পড়াও পছন্দ ছিল না, তাদেরকে এমন আপন ও প্রিয় বানিয়ে দেওয়া হয় যে, তাদের ছাড়া জীবনের সঠিক কল্পনাও হতে পারে না। তারা একে অপরের জীবনসঙ্গী ও দায়িত্বশীল হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এমন, প্রেম-ভালবাসা ও আস্থা বিশ্বাসের সম্পর্ক, কখনও কখনও তা মাতা-পিতার সম্পর্ক থেকেও বেড়ে যায়। যে অলৌকিকতা, যে বিশ্বাস, যে প্রেম, যে সততা, যে সহজাত প্রবৃত্তি ও স্বভাবধর্মীতা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়, অন্য কোনো আত্মীয়ের মাঝে তা কল্পনাও করা যায় না। এসব আল্লাহর নামের যাদু। আল্লাহর নামটি যখন তাদের মাঝে আসে, তখন নতুন এক পৃথিবী অস্তিত্ব লাভ করে। গতকাল পর্যন্ত যে পর ছিল, আজ সে নিজের চেয়েও আপন হয়ে গেল। একজন মুসলমান পুরুষ, একজন মুসলমান নারী একে অপরের সাথে এমনিতেই কখনো দ্বিধাহীন-বাঁধাহীন হতে পারে না। অনেক সময় একে অন্যের সাথে সফরও করতে পারে না। একে অন্যের জন্য না-মাহরাম, পরনারী, পরপুরুষ। কিন্তু যখন মধ্যখানে আল্লাহর নাম এসে যায়, তখন এক পবিত্র বন্ধন, মধুর সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ বলেন– যে নাম মাঝখানে এনে হারামকে হালাল কর, অবৈধকে বানাও বৈধ এবং নিজের জীবনে সৃষ্টি কর এক মহা বিপ্লব, সেই পবিত্র ও মহান নামের লাজও রাখা উচিত। স্বামী-স্ত্রীর গভীর ও সুদৃঢ় সম্পর্কের কথা কুরআনে কারীমে এক ভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করেছে। বলেছে, هن لباس لكم وانتم لباس لهن –তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের পোশাক; আর তোমরা (স্বামীগণ) তাদের পোশাক। তোমরা একে অপরের পোশাক হয়ে যাও। এটাও কুরআনে কারীমের একটি অলৌকিকতা! আল্লাহ পাক এখানে 'পোশাক' শব্দ ব্যবহার করেছেন। যা লজ্জা ঢাকা ও জীবনের সৌন্দর্যে অতীব প্রয়োজনীয়। 'পোশাক' শব্দে সে সব বিষয় পুরোই এসে গেছে, যেগুলো স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও আস্থা-বিশ্বাসের ব্যাপারে অধিকতর বলা যেতে পারে। তোমরা তাদের জন্য পোশাক; তারা তোমাদের জন্য পোশাক। যেভাবে পোশাক ছাড়া মানুষকে পশুর মত দেখায়, একটি বন্য জংলী প্রাণী মনে হয়, তদ্রুপ দাম্পত্য ও বৈবাহিক জীবন ছাড়া মানুষকে অসভ্য দেখা যায়। একে অসভ্য বর্বর মনে করাই উচিত।

দাম্পত্য জীবন একটি এবাদত

ইসলামে দাম্পত্য জীবন ও বৈবাহিক সম্পর্ককে নিছক জীবনের একটি প্রয়োজন হিসেবে দেখা হয় নি বরং একে একটি এবাদতের মর্যাদা দেওয়া

হয়েছে। যার দ্বারা মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। অর্থাৎ আমাদের ধর্মে দাম্পত্য সম্পর্ক ও বিবাহ বন্ধনের ধারণা শুধু এতটুকুই নয় যে, জীবনের প্রয়োজনের নিমিত্তে এটা করতেই হত। নতুবা জীবনের স্বাদ উপভোগ করা যেত না; জীবন উপভোগ্য হত না বরং একে দ্বীনী ও ধর্মীয় রূপ দেওয়া হয়েছে। একে এবাদত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর তাই রাসূলে কারীম সা. আপন জীবনে এর সবচেয়ে বড় আদর্শ-উপমা পেশ করছেন। অধিকন্তু তিনি বলেছে– তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ওই ব্যক্তি, যে তার ঘরের লোকদের (স্ত্রীগণের) জন্য সবচেয়ে ভাল হবে আর আমি আমার ঘরের মানুষদের জন্য তোমাদের সবার চেয়ে ভাল।"

সুতরাং আপনারা যদি রাসূলে কারীম সা. এর জীবন-চরিত অধ্যয়ন করেন, তবে দেখতে পাবেন, নবীজীর মধ্যে নারীজাতির যে সম্মানবোধ, তাদের আবেগ-উচ্ছাস, আগ্রহ-উদ্যম ও সূক্ষ্ম উপলব্ধি এবং তাদের লক্ষ্য ছিল– নারী সমাজের বড় বড় উকীল এবং নারীর অধিকার ও সম্মানের বড় বড় দাবিদারের মধ্যেও তার দেখা পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে তা বড় বড় পুণ্যবান লোকজন, সাধু-সন্যাসী, সাধক-ঠাকুর, এমনকি অন্যান্য নবী-রাসূলগণেরও জীবনে পাওয়া যাওয়া কঠিন। পুণ্যবতী স্ত্রীগণের মনোরঞ্জন, তাদের বৈধ আনন্দ-বিনোদনে অংশগ্রহণ, তাদের আবেগ-উচ্ছাস, উদ্যম-আগ্রহের খেয়াল রাখা এবং তাদের মধ্যে যে মিথ্যাচার ও ন্যায়ানুগতা প্রদর্শন করতেন, তার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

কেবল তাদের সঙ্গেই নয়; শিশুদের সাথেও নবীজী সা. এরূপ আচরণ করতেন। নামাযের মতো অতিপ্রিয় ইবাদতও তিনি কেবল একারণে সংক্ষিপ্ত করে দিতেন, যাতে কোনো মায়ের কষ্ট না-হয়। যদি কোনো শিশু কাঁদত, তখনও তিনি নামায সংক্ষেপ করতেন। এটা চরম আত্মত্যাগ, রাসূলে কারীম সা. এর জন্য তো নামায অপেক্ষা বড় কোনও জিনিসই ছিল না। এর চেয়ে বড় কোনও কুরবানী হতে পারে না। তিনি বলতেন– অনেক সময় আমার মনে চায়, দীর্ঘ নামায পড়ি। কিন্তু যখন কোনও শিশুর কান্নার শব্দ শুনতে পাই, তখন আমার চিন্তা হয়, কখন যেন তার মায়ের মনে কষ্ট লেগে যায়! তার মায়ের মন ঘাবড়িয়ে যায়! একারণে আমি নামায সংক্ষেপ করে দেই।

পাশ্চাত্য সভ্যতার পতন শুরু

আমাদের সামনে এই আদর্শ আছে। আল্লাহ পাক বলেন, যে নামটি তোমরা মধ্যখানে নিয়ে এলে, তার লাজও রাখা চাই। এমন যেন না হয় যে, এর দ্বারা শুধু স্বার্থ আর স্বার্থই হাসিল করলে। এই নির্দেশ নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য।

আপনারা এখানে আমেরিকান সোসাইটিতে আছেন, এখানে আমাদের শুধু ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসগুলো উপস্থাপন করলে হবে না বরং ইসলামের গোষ্ঠীগত সমাজব্যবস্থাও পেশ করতে হবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার পতন শুরু হয়ে গেছে। দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের পথে। আপনারাও উপলব্দি করছেন সে অধঃপতন। এটা কোনও অস্পষ্ট বা গোপন বাস্তবতা নয়। এর বড় একটি কারণ হল, এখানকার বংশীয় ব্যবস্থায় এক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে গেছে। পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। তাতে চলছে চরম বিক্ষিপ্ততা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে আস্থা-বিশ্বাস এবং প্রেম-ভালবাসা থাকা উচিত, দিনদিন তাতে ঘাটতি আসছে। আজকের গবেষক-চিন্তাবিদগণ উদ্বিগ্ন। বিভিন্ন বই-পুস্তক লেখা হচ্ছে পাশ্চাত্যের সমাজব্যবস্থাকে ভেঙ্গে পড়া থেকে, বিশৃঙ্খল হয়ে যাওয়া থেকে কিভাবে রক্ষা করা যায়? দু'পক্ষের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা থাকা উচিত। জীবনের প্রকৃত স্বাদ এখানেই। তখন অভাব-অনটন, ক্ষুৎপিপাসা হলেও স্বানন্দে তা সহ্য করে নেওয়া হয়। এখনও আমাদের প্রাচ্যদেশগুলোতে এমন অনেক পরিবার রয়েছে, যেখানে অতিকষ্টে খাবার যোগাড় হয়। কিন্তু তারা জান্নাতের স্বাদ উপভোগ করে। কারণ, পরস্পর ভালবাসা আছে। একে অন্যের মুখ দেখে নিজের ক্ষুৎপিপাসা এবং নিজের দুঃখ-যাতনা ভুলে যায়। অথচ এখানে সবকিছু আছে। সকল উপকরণ, ভোগ-সামগ্রী পদতলে স্তুপ হয়ে আছে। বিশ্বজগতের অনেক শক্তিকেই তারা পদানত করে নিয়েছে। কিন্তু তারা নিজের হৃদয়রাজ্যকে, মনের পৃথিবীকে এবং নিজের ঘরকে জান্নাতে রূপান্তর করতে পারে না। যেমনটি আল্লামা ইকবাল বলেছেন–

ڈھونڈھنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا
اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا

"নক্ষত্রের কক্ষপথ সন্ধানকারী, নিজের চিন্তার গবেষণার পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে পারল না।"

সুখান্বেষণ

যে লোক সূর্যের কিরণগুলো নিজের মুষ্ঠিবদ্ধ করে নিয়েছে, জীবনের অন্ধকার রাতকে প্রভাত করতে পারে নি, আর নক্ষত্রপুঞ্জের কক্ষপথ অনুসন্ধানকারী– যদি ইকবাল হতেন তবে বলতেন– চাঁদে গমনকারী পশ্চিমা লোক নিজের চিন্তাধারার পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে পারে নি। যে পৃথিবীকে জান্নাত বানানোর চেষ্টা করেছে, তার ঘর জাহান্নাম হয়েছে। বহু আমেরিকান ও ইউরোপীয় পরিবার এমন আছে, যাদের ঘরে সুখ-শান্তির কোনও উপাদান নেই। কাজেই আজ আমরা দেখছি,

তারা বাইরের ভ্রমণ-বিলাস আর কুকুরের মধ্যে সুখ-শান্তি খুঁজে ফিরছে। কেননা শান্তি তাদের ঘরে সহজসাধ্য নয়। ঘরে এসে তাদের অনুভূত হয় না যে, তারা পার্থিব বা নৈসর্গিক জান্নাতে পৌঁছে গেছে বরং তারা ঘরের জীবন থেকে, পরিবার জীবন থেকে পলায়ন করে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

প্রয়োজন ও সম্মান

আমি মনে করি, যারা এখানে দশ বছর, বিশ বছর যাবৎ জীবন কাটাচ্ছেন, তারা আমার চেয়ে বেশিই জানেন এই যন্ত্রণাদগ্ধ ও দুর্বল দিক সম্পর্কে। আমার খুব বেশি বলার প্রয়োজন নেই। মোটকথা, পূর্বোক্ত আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা ইসলামী সমাজের একটি মৌলিক চিত্র উপস্থাপন করেছেন। এ সমাজ একে অন্যের প্রয়োজন পূরণ ও সম্মান প্রদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রয়োজন তো সবারই হয়। কিন্তু প্রয়োজন উপলব্ধি করা আর যার দ্বারা সে প্রয়োজন পূরণ হতে পারে, তার মূল্যায়ন করা দুটি আলাদা বিষয়। দুটি ভিন্ন ভিন্ন মানসিক অবস্থা। এই মানসিক অবস্থা ইসলাম সৃষ্টি করতে চায়, যাতে আমাদের প্রত্যেকেই নিজেকে অন্যের মুখাপেক্ষী মনে করে। নিজের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে এবং অপরকে সম্মান প্রদর্শন করে। যদি এই চিন্তাধারা পুরোপুরি স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং হৃদয় মানসপটে গেঁথে যায়, তা হলে এরপর আর কোনও খাঁদ বা ছিদ্র বাকি থাকবে না।
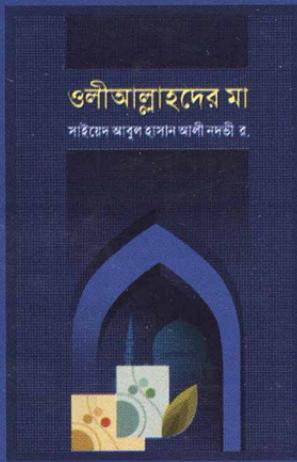
আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করি, আল্লাহ যেন আপনাদের সকলকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। আপনারা এদেশে ইসলামী জীবন এবং ইসলামী সমাজের এমন আদর্শ নমুনা উপস্থাপন করবেন, যা এখানকার জীবনবিমুখ ও বিতৃষ্ণ হয়ে পড়া সমাজের জন্য চিত্তাকর্ষক ও মনোহারী প্রমাণ হয়। বিচক্ষণতার সাথে যেন তারা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা এবং এর পারস্পরিক সম্পর্কগুলোও অধ্যায়ন করে আর নিজের জন্য একেই অগ্রাধিকার দেয়; তাদের আগ্রহ জন্মে, আহ! আমাদেরও যদি এ নেয়ামত লাভ হত!

যদি আপনারা এমনটি করেন, তা হলে আপনারা না শুধু এদেশের বিরাট বড় খেদমত আঞ্জাম দিলেন বরং ইসলামের অনেক বড় খেদমত আঞ্জাম দিলেন। আর এটা হবে ইসলামের এক মহান দাওয়াত ও তাবলীগ।

সমাপ্ত

ওলীআল্লাহদের মা

প্রকাশক	: আল ইরফান পাবলিকেশন্স
প্রকাশকাল	: জুন ২০১০ ঈ.
অক্ষর বিন্যাস	: ফ্রেন্ডস্ কম্পিউটার্স
প্রচ্ছদ	: সাজ ক্রিয়েশন
মূল্য	: ৭২ (বাহাত্তর টাকা মাত্র)